

মীর আলি চোখে দেখে না।

আগে আবছা আবছা দেখত। দুপুরের রোদের দিকে তাকালে হলুদ কিছু ভাসত চোখে। গত দুবছর ধরে তাও ভাসছে না। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। তার বয়স প্রায় সত্তর। এই বয়সে চোখ-কান নষ্ট হতে শুরু করে। পৃথিবী শব্দ ও বর্ণহীন হতে থাকে। কিন্তু তার কান এখনো ভালো। বেশ ভালো। ছোট নাতনিটি যতবার কেঁদে ওঠে ততবারই সে বিরক্ত মুখে বলে, 'চুপ, শব্দ করিস না।'

মীর আলি আজকাল শব্দ সহ্য করতে পারে না। মাথার মাঝখানে কোথায় যেন ঝনঝন করে। চোখে দেখতে পেলেও বোধহয় এরকম হতো-আলো সহ্য হতো না। বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা! সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণা রাতদুপুরে বাইরে যেতে হয়। একা একা যাওয়ার উপায় নেই। তাকে তলপেটের প্রবল চাপ নিয়ে মিহি সুরে ডাকতে হয়, 'বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!'

বদিউজ্জামান তার বড় ছেলে। মধুবন বাজারে তার একটা মনিহারী দোকান আছে। রোজ সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে সাত মাইল হেঁটে সে বাড়ি আসে। পরিশ্রমের ফলে তার ঘুম হয় গাঢ়। সে সাড়া দেয় না। মীর আলি ডেকেই চলে, 'বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!' জবাব দেয় তার ছেলের বউ অনুফা। অনুফার গলায় স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ স্বর কানে এলেই মীর আলির মাথা ধরে। তবু সে মিষ্টি সুরে বলে, 'ও বৌ, এটু বাইরে যাওন দরকার। বদিরে উঠাও।'

অনুফা তার স্বামীকে জাগায় না। নিজেই কুপি হাতে এগিয়ে এসে শ্বশুরের হাত ধরে। বড় লজ্জা লাগে মীর আলির। কিন্তু উপায় কী? বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। অনেক কষ্ট। মীর আলি নরম স্বরে বলে, 'চাঁদনি রাইত নাকি, ও বৌ?' 'জি না।'

'চউখে ফসর ফসর লাগে। মনে হয় চাঁদনি।'

'না, চাঁদনি না। এইখানে বসেন। এই নেন বদনা।'

অনুফা দূরে সরে যায়। মীর আলি ভারমুক্ত হয়। অন্যরকম একটা আনন্দ হয় তার। ইচ্ছা করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে। অনুফা ডাকে, 'আব্বাজান, হইছে?'

'হুঁ।'

'উঠেন। বইসা আছেন কেন?'

'ফজর ওয়াক্তের দেরি কত?'

'দেরি আছে। আব্বাজান উঠেন।'

মীর আলি অনুফার সাহায্য ছাড়াই উঠানে ফিরে আসে। দক্ষিণ দিক থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে বোধহয়। একটা-দুটা করে শিয়াল ডাকতে শুরু করেছে।

মীর আলি হুট গলায় বলে, 'রাইত বেশি বাকি নাই।'

অনুফা জবাব দেয় না, হাই তোলে।

'একটা জলটোঁকি দেও, উঠানে বইয়া থাকি।'

'দুপুর-রাইতে উঠানে বইবেন কী? যান, ঘুমাইতে যান।'

মীর আলি বাধ্য ছেলের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ে। একবার ঘুম ভাঙলে বাকি রাতটা তার জেগে কাটাতে হয়। সে বিছানায় বসে ঘরের স্পষ্ট-অস্পষ্ট সব শব্দ অত্যন্ত মন দিয়ে শোনে।

বদি খুকখুক করে কাশছে। টিনের চালে ঝটপট শব্দ। কীসের শব্দ? বানর? চৌকির নিচে সবগুলো হাঁস একসঙ্গে প্যাকপ্যাক করল। বাড়ির পাশে শেয়াল হাঁটাচাঁটা করছে বোধহয়। পরীবানু কেঁদে উঠল। দুধ খেতে চায়। অনুফা দুধ দেবে না। চাপা গলায় মেয়েকে শাসাচ্ছে। বদি আবার কাশছে। ঠান্ডা লেগেছে নাকি? পরশু দিন ভিজ়ে বাড়ি ফিরেছে। জ্বর তো হবেই। বদির কথা শোনা যাচ্ছে। ফিসফিস করে কী যেন বলছে।

কী বলছে? এত ফিসফিসানি কেন? মীর আলি কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। কাক ডাকল। সকাল হচ্ছে নাকি? মীর আলি ভোরের প্রতীক্ষা করে, তার তলপেট আবার ভারী হয়ে ওঠে।

‘বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!’

‘কী?’

‘এটু বাইরে যাওন দরকার।’

বদি সাড়াশব্দ করে না। পরীবানু তারস্বরে কাঁদে। দুধ খেতে চায়।

‘ও বদি, বদিউজ্জামান।’

‘আসি আসি।’

‘তাড়াতাড়ি কর।’

‘আরে দুত্তোরি! এক রাইতে কয়বার বাইরে যাইবেন?’

বদি প্রচণ্ড একটা চড় বসায় পরীবানুর গালে। বিরক্ত গলায় বলে, ‘টচটা দাও অনুফা।’

অনুফা টচ খুঁজে পায় কিন্তু অন্ধকারে ব্যাটারি খুঁজে পায় না।

মীর আলি অপেক্ষা করতে করতে একসময় অবাক হয়ে বুঝতে পারে তার প্রস্রাব হয়ে গেছে। বিছানার একটা অংশ ভেজা। সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। এরকম তার আগে কখনো হয়নি।

‘আসেন যাই। যত ঝামেলা! দেখি হাতটা বাড়ান।’

বদি তার হাত ধরে। মীর আলি খুব দুর্বল ও অসহায় বোধ করে।

‘এখন থাইক্যা ঘরের মইধ্যে একটা পাতিলে পেশাব করবেন। ঝামেলা ভালো লাগে না।’

‘আইচ্ছা।’

‘আর পানি কম খাইবেন। বুঝলেন?’

‘আইচ্ছা।’

বদি তাকে উঠোনের এক মাথায় বসিয়ে দেয়। মীর আলি প্রস্রাব করার চেষ্টা করে। প্রস্রাব হয় না, ভোঁতা একটা যন্ত্রণা হয়।

বদি হাঁক দেয়, ‘কী হইছে? রাইত শেষ করবেন নাকি?’

আর ঠিক তখন মীর আলির সামনে দিয়ে সরসর শব্দ করে একটা কিছু চলে যায়। কী এটা! সাপ? মীর আলির দেখতে ইচ্ছা করে।

‘আরে! বিষয় কী, ঘুমাইয়া পড়ছেন নাকি?’

‘নাহ্! একটা সাপ গেল সামনে দিয়া।’

‘আরে দুত্তোরি সাপ! উঠেন দেখি।’

‘মনে হয় জ্ঞাতি সাপ। বিরাট লম্বা মনে হইল।’

‘আরে ধুৎ! উইঠা আসেন।’

মীর আলি উঠে দাঁড়ায়। আর ঠিক তখন আজান হয়। মীর আলি হাসিমুখে বলে, 'আজান দিচ্ছে। ও বদি, আজান দিচ্ছে।'

'দিচ্ছে দেউতখ। ঘরে চলেন।'

'ওখন আর ঘরে গিয়া কী কাম? গোসলের পানি দে। গোসল সাইরা নামাজটা পড়ি।'

বদি বিরক্ত গলায় বলে, 'অজু কইরা নামাজ পড়েন। গোসল ক্যান?'

'শইলডা পাক না। নাপাক শইল।'

'আপনে থাকেন বইয়া, অনুফারে পাঠাই। যত কামেলা!'

বদিউজ্জামান তার বাবাকে একটা জলচৌকির ওপর বসিয়ে ভেতরে চলে যায়। আর আসে না। পরী বানু ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদে। মীর আলি বসে থাকে চুপচাপ।

তার কিছুক্ষণ পর পঞ্চাশজন সৈন্যের ছোট একটা দল গ্রামে এসে ঢোকে। মার্চ-টার্চ না, এলোমেলোভাবে চপা। তাদের পায়ের বুটে কোনো শব্দ হয় না। তারা যায় মীর আলির বাড়ির সামনে দিয়ে এবং তাদের একজন মীর আলির চোখে পাঁচ ব্যাটারি টর্চের আলো ফেলে। মীর আলি কিছু বুঝতে পারে না। শুধু উঠানে বসে থাকা কুকুরটা তারদ্বারা ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। মীর আলি ভীত স্বরে ডাকে, 'বদি, ও বদি! বদিউজ্জামান!'

কুকুরটি একসময় আর ডাকে না। দলটির পেছনে পেছনে কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তারপর দ্রুত ফিরে আসে মীর আলির কাছে। মীর আলি উঁচু গলায় ডাকে, 'ও বদি! ও বদিউজ্জামান!'

'কী হইছে? বেহুদা চিল্লান কেন?'

'বাড়ির সামনে দিয়া কারা যেন গেল।'

'আরে দুগোরি! যত ফালতু কামেলা। চুপ কইরা বইয়া থাকেন।'

মীর আলি চুপ করে যায়। চুপ করে থাকে কুকুরটিও। নিম্নশ্রেণির প্রাণীরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। তারা টের পায়। গ্রামের নাম নীলগঞ্জ। পহেলা মে। উনিশশো একাত্তর। ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক একজন মেজর-এজাজ আহমেদ। কাকুল মিলিটারি একাডেমির একজন কৃতী ক্যাডেট। বাড়ি পেশোয়ারের এক অখ্যাত গ্রামে। তার গায়ের নাম রেশোবা।

২

ময়মনসিংহ-ভৈরব লাইনের একটি স্টেশন নান্দাইল রোড।

ছোট গরিব স্টেশন। মেল ট্রেন থাকে না। লোকাল ট্রেন মিনিটখানেক থেকেই ক্ল্যাগ উড়িয়ে পালিয়ে যায়। স্টেশনের বাইরে ইট-বিছানো রাস্তায় চার-পাঁচটা রিকশা ঠুন ঠুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে যাত্রী ধোঁজে। সুরেলা গলা শোনা যায়, 'রুয়াইল বাজার যাওনের কেউ আছুইন। রুয়াইল বা-জা-র?'

রুয়াইল বাজার এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার। নান্দাইল রোড থেকে সোজা উত্তরে দশ মাইল। খুব খারাপ রাস্তা। বর্ষাকালে রিকশা চলে না। হেঁটে যেতে হয়। এঁটেল মাটিতে পা দেবে যায়, থিক থিক ঘন কাদা। নান্দাইল রোড থেকে রুয়াইল বাজার আসতে বেলা পুইয়ে যায়।

বাজারটি অন্য সব গ্রাম্য বাজারের মতো। তবে স্থানীয় লোকদের খুব অহংকার একে নিয়ে। কী নেই এখানে? ধানচালের আড়ত আছে। পাটের গুদাম আছে। ধান ভাঙানোর কল আছে। চায়ের দোকান আছে। এমনকি রেডিও সারাবার একজন কারিগর পর্যন্ত আছে। গ্রামের বাজারে এরচেয়ে বেশি কী দরকার?

কুয়াইল বাজারকে পেছনে ফেলে আরও মাইল ত্রিশেক উত্তরে মধুবন বাজার। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা গরুর গাড়ি। তাও শীতকালে। বর্ষায় হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উজান দেশ। নদীনালা নেই যে নৌকা চলেবে। মধুবন বাজার পেছনে ফেলে পূর্বদিকে সাত-আট মাইল গেলে ঘন জঙ্গল। স্থানীয় নাম মধুবনের জঙ্গল মাঠ। কাঁটাবোপ, বাঁশ আর জারঙ্গলের মিশ্র বন। বেশ কিছু গাব ও ডেফলাজাতীয় অজ্ঞাত শ্রেণির গাছও আছে। জঙ্গল মাঠের এক অংশ বেশ নিচু। সেখানে মোরতা গাছের ঘন অরণ্য। শীতকালে সেইসব মোরতা কেটে এনে পাটি বোনা হয়। পাকা লটকনের খোঁজে বালক-বালিকারা বনের ভেতর ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বর্ষাকালে কেউ যায় না সেদিকে। খুব সাপের উপদ্রব। বনে ঢুকে প্রতি বছরই দু-একটা গরু-ছাগল সাপের হাতে মারা পড়ে।

জঙ্গল মাঠের পেছনে নীলগঞ্জ গ্রাম। দরিদ্র, শ্রীহীন, ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটিকে কান্তের মতো দূরদিকে ঘিরে আছে। সেখানে শীতকালে প্রচুর পাখি আসে। পাখি-মারা জাল নিয়ে পাখি ধরে বাজারে বিক্রি করে পাখি-মারারা। চাষবাস যা হয় দক্ষিণের মাঠে। জমি উর্বর নয় কিংবা এরা ভালো চাষি নয়। ফসল ভালো হয় না। তবে শীতকালে এরা প্রচুর রবিশস্য করে। বর্ষার আগে-আগে করে তরমুজ ও বাঙ্গি। দক্ষিণের জমিতে কোনোরকম যত্ন ছাড়াই এ দুটি ফল প্রচুর জন্মায়। গ্রামের অধিকাংশ ঘরেই খড়ের ছাউনি। সম্প্রতি কয়েকটি টিনের ঘর হয়েছে। বদিউজ্জামানের ঘরটি টিনের। তার হাতে এখন কিছু পয়সাকড়ি হয়েছে। টিনের ঘর বানানো ছাড়াও সে একটা সাইকেল কিনেছে। চালানো শিখে উঠেন বলে এখনো সে হেঁটেই মধুবন বাজারে যায়। সপ্তাহে একবার নতুন সাইকেলটি ঝাড়পৌছ করে। গ্রামের একমাত্র পাকা দালানটি প্রকাণ্ড। দুবিঘা জমির ওপর একটা হুলুস্থল ব্যাপার। সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার নায়েব চন্দ্রকান্ত সেন মশাই এ বাড়ি বানিয়ে গৃহপ্রবেশের দিন সর্পাঘাতে মারা পড়েন।

চন্দ্রকান্ত সেন প্রচুর ধনসম্পদ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেসবের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। সবার ধারণা, সোনাদানা পিতলের কলসিতে ভরে তিনি যথ করে গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা পিতলের কলসির খোঁজে প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। চন্দ্রকান্ত সেন মশাইয়ের বর্তমান একমাত্র উত্তরাধিকারী নীলু সেন প্রকাণ্ড দালানটিতে থাকেন। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। দেখায় তার চেয়েও বেশি। নীলু সেনকে গ্রামে যথেষ্ট খ্যাতির করা হয়। যাবতীয় সালিশিতে তিনি থাকেন। বিরোধদির কোনো কথাবার্তা তাঁকে ছাড়া কখনো হয় না। লোকটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী। এ গ্রামে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি হচ্ছে জয়নাল মিয়া। প্রচুর বিষয়সম্পত্তির মালিক। মধুবন বাজারে তার দুটি ঘরও আছে। লোকটি মেরুদণ্ডহীন। সবার মন রেখে কথা বলার চেষ্টা করে। গ্রাম্য সালিশিতে সবার কথাই সমর্থন করে বিচার-সমস্যা জটিল করে তোলে। তবু সবাই তাকে মোটামুটি সহ্য করে। সম্পদশালীরা এই সুবিধাটি সব জায়গাতেই ভোগ করে।

দুজন বিদেশি লোক আছেন নীলগঞ্জে। একজন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। এত জায়গা থাকতে তিনি এই দুর্গম অঞ্চলে ইমামতি করতে কেন এসেছেন সে রহস্যের মীমাংসা হয়নি। তিনি মসজিদেই থাকেন। মাসের পনেরো দিন জয়নাল মিয়ার বাড়িতে খান। বাকি পনেরো দিন পালা করে অন্য ঘরগুলোতে খান। কিছুদিন হলো তিনি বিয়ে করে এই গ্রামে স্থায়ীভাবে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

প্রস্তাবটিতে কেউ এখনো তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। ধানি জমি দিতে পারে জয়নাল মিয়া। সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে। শুনেও না-শোনার ভান করছে। দ্বিতীয় বিদেশি লোকটি হচ্ছে আজিজ মাস্টার। সে নীলগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। প্রাইমারি স্কুল সরকারি সাহায্যে তিন বছর আগে শুরু হয়। উদ্দেশ্য বোধহয় একটিই—দুর্গম অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছানো। উদ্দেশ্য সফল হয়নি। শিক্ষকরা কেউ বেশিদিন থাকতে পারে না।

খাতাপত্রে তিনজন শিক্ষক থাকার কথা। এখন আছে একজন-আজিজ মাস্টার। লোকটি রুগুণ, নানান রকম অসুখ-বিসুখ। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে হাঁপানি। শীতকালে এর প্রকোপ হয়। গরমকালটা মোটামুটি ভালোই কেটে যায়। আজিজ মাস্টার একজন কবি। সে গত তিন মাসে চার নম্বর একটি রুলটানা খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি কবিতা একটি রমণীকে উদ্দেশ্য করে লেখা, যাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে, যেমন-স্বপ্ন-রানী, কেশবতী, অচিন পাখি ইত্যাদি। তার তিনটি কবিতা নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক কিবাণ পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছে। আজিজ মাস্টারের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে গ্রামের লোকজন ওয়াকিবহাল। তারা এই কবিকে যথেষ্ট সমীহ করে। সমীহ করার আরেকটি কারণ হলো, আজিজ মাস্টার গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। বিএ পর্যন্ত পড়েছিল। পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তার আবার পরীক্ষা দেওয়ার কথা।

সে জয়নাল মিয়া'র একটি ঘরে থাকে। তার স্ত্রীকে সে 'ভাবিসাব' ডাকে কিন্তু তার বড় মেয়েটিকে দেখলেই কেমন যেন বিচলিত বোধ করে। মেয়েটির নাম মালা। মাঝে মাঝে মালা তাকে ভাত বেড়ে দেয়। সে-সময়টা আজিজ মাস্টার বড় অসুস্থি বোধ করে। সে যখন বলে, 'মামা, আরেকটু ভাত দেই?' তখন কোনো কারণ ছাড়াই আজিজ মাস্টারের কান-টান লাল হয়ে যায়। আজিজ মাস্টার কয়েকদিন আগে 'মালা রানী' নামের একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছে। কবিতাটি 'কিবাণ' পত্রিকায় পাঠাবে কি না এ নিয়ে সে খুব চিন্তিত। হয়তো পাঠাবে। নীলগঞ্জের যে দিকটায় জলাভূমি, একদল কৈবর্ত থাকে সেদিকে। গ্রামের সঙ্গে তাদের খুব একটা যোগ নেই। মাছ ধরার সিজনে জলমহালে মাছ মারতে যায়। আবার ফিরে আসে। কর্মহীন সময়টাতে চুরি-ডাকাতি করে। নীলগঞ্জের কেউ এদের ঘাঁটায় না।

গত বৎসর কৈবর্তপাড়ায় খুন হলো একটা। নীলগঞ্জের মাতবররা এমন ভাব করলেন যেন তাঁরা কিছুই জানেন না। থানা-পুলিশ কিছুই হলো না। যার ছেলে খুন হলো সেই চিত্রা বুড়ি কিছুদিন ছোট্টাছুটি করল নীলু সেনের কাছে। নীলু সেন শুকনো গলায় বললেন, 'তোদের ঝামেলা তোরা মিটা। থানাওয়ালার কাছে যা।' বুড়ি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'থানাওয়ালার কাছে গেলে আমারে দহের মইধ্যে পুঁইস্তা থুইব কইছে।' নীলু সেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। টেনে টেনে বললেন, 'এদের ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না। রক্তগরম জাত। কী করতে কী করে।'

'বিচার আইত না?'

নীলু সেন তার জবাব দিতে পারলেন না। অস্পষ্টভাবে বললেন, 'এখন বাদ দে। পরে দেখি কিছু করা যায় কি না।' বুড়ি আরও কিছুদিন ছোট্টাছুটি করল। এবং একদিন দেখা গেল কৈবর্তরা দলবেঁধে জলমহালে মাছ মারতে গিয়েছে। বুড়িকে সঙ্গে নেয়নি। বুড়ি আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করল কিছুদিন। নীলু সেনের দালানের একপ্রান্তে থাকতে লাগল। চরম দুর্দিন। কৈবর্তরা ফিরে এলো তিনমাস পর, কিন্তু বুড়ির জায়গা হলো না। সে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ভিক্ষা করে খেতে লাগল। হতদরিদ্র নীলগঞ্জের প্রথম ভিক্ষুক।

সব গ্রামের মতো এই গ্রামে একজন পাগলও আছে। মতি মিয়া'র শালা নিজাম। সে বেশির ভাগ সময়ই সুস্থ থাকে। শুধু দু-একদিন মাথা গরম হয়ে যায়। তখন তার গারে কোনো কাপড় থাকে না। গ্রামের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছোট্টাছুটি করতে থাকে। দুপুরের রোদ খুব বেড়ে গেলে মধুবন জঙ্গলায় ঢুকে পড়ে। 'পাগলদের সাগে কাটে না' প্রবাদটি হয়তো সত্যি। নিজাম বহাল তবিয়েতেই বন থেকে বেরিয়ে আসে। ছোট্টাছুটি করা এবং বনের ভেতরে বসে থাকা ছাড়া সে অন্য কোনো উপদ্রব করে না। গ্রামের পাগলদের গ্রামবাসীরা খুব স্নেহের চোখে দেখে। তাদের প্রতি অন্য একধরনের মমতা থাকে সবার।

৩

চিত্রা বুড়ি রাতে একনাগাড়ে কখনো ঘুমায় না।

ক্ষণে-ক্ষণে জেগে উঠে চোঁচায়, 'কেলা যায় গো? লোকটা কে?'

তার ঘুমোবার জায়গাটা হচ্ছে সেনবাড়ির পাকা কালীমন্দিরের চাতাল। নীলু সেন তাকে থাকবার জন্য একটা ঘর দিয়েছিলেন। সেখানে নাকি তার ঘুম হয় না। দেবীমূর্তির পাশে সে বোধহয় একধরনের নিরাপত্তা বোধ করে। গভীর রাতে দেবীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হয়, যেমন—'দেখিস হেই মা কালী, আমার পুত্রে যে মারছে তুই তার কইলজাটা টাইন্যা খা। তরে আমি জোড়া পাঁঠা দিমু। বুক চিইরা রক্ত দিমু—হেই মা কালী, দেখিস রে বোটি, দেখিস।'

মা কালী কিছু শোনেন কি না বলা মুশকিল। কিন্তু চিত্রা বুড়ির ধারণা, তিনি শোনেন এবং তিনি যে শুনছেন তার নমুনাও দেন। যেমন—এক রাত্রিতে খলখল হাসির শব্দ শোনা গেল। বুড়ির রক্ত জল হয়ে যাবার মতো অবস্থা। সে কাঁপা গলায় ডাকল, 'হেই মা।' হাসির শব্দ দ্বিতীয়বার আর শোনা গেল না। দেবীরা তাঁদের মহিমা বারবার করে দেখাতে ভালোবাসেন না।

চিত্রা বুড়ি আজ রাতেও মা কালীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনেক কথা বলল। জোড়া পাঁঠার আশ্বাস দিয়ে ঘুমাতে গেল। তারপর জেগে উঠে চোঁচাল, 'কেলা যায় গো? লোকটা কে?' কেউ জবাব দিলো না, কিন্তু বুড়ির মনে হলো অনেকগুলো মানুষ যেন এদিকে আসছে। শব্দ করে পা ফেলছে। হুঁ হাঁ হুঁ হাঁ এরকম একটা আওয়াজও আসছে। ডাকাত নাকি? চিত্রা বুড়ি ভয়ে কাঁপ হয়ে গেল। তার চোখের সামনে দিয়ে মিলিটারি দলটি পার হলো। আলো কম। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না।

চিত্রা বুড়ি কিছু বুঝতে পারল না। এরা কারা? এই রাতে কোথেকে এসেছে? বুড়ি দেখল, সেনবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার টর্চের আলো ফেলল। এর মানে কি ডাকাত? কিন্তু সেনবাড়িতে ডাকাত আসার কথা নয়। সেনরা এখন হতদরিদ্র। এই বিশাল বাড়ির ইটগুলো ছাড়া ওদের আর কিছুই নেই।

ওরা আবার চলতে শুরু করেছে। জুম্মাঘরের কাছে এসে আবার সেনবাড়ির ওপর টর্চের আলো ফেলল। কোনদিকে যাচ্ছে? কৈবর্তপাড়ার দিকে? ওদের আগেভাগে খবর দেওয়া দরকার। সেনবাড়ির পেছন দিক দিয়ে ছুটে গিয়ে খবর দেবে? চিত্রা বুড়ির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগছে। এই রাতের বেলা দলবেঁধে এরা কেন আসবে?

না, কৈবর্তপাড়ার দিকে যাচ্ছে না। জুম্মাঘর পেছনে ফেলে এরা সড়কে উঠে গেল। টর্চের আলো এখন আর ফেলছে না। বুড়ির মনে হলো এরা স্কুলঘরের দিকে যাচ্ছে। আজিজ মাস্টারকে খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু তারও আগে খবর দেওয়া দরকার কৈবর্ত পাড়ায়। বিপদের সময় নিজ গোত্রের মানুষের কথাই প্রথম মনে পড়ে।

চার-পাঁচটা কুকুর একসঙ্গে চোঁচাচ্ছে। এরা কিছু টের পেয়েছে। কুকুর-বেড়াল অনেক কিছু আগেভাগে জানে। বুড়ি কালীমন্দিরের চাতাল থেকে নেমে এলো। সে কোনদিকে যাবে মনস্থির করতে পারছে না।

গ্রামে মিলিটারি চুকেছে এটা প্রথম বুঝতে পারলেন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। পাকা মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি সুরা ইয়াসিন পড়ছিলেন। আজান দেবার আগে তিনি তিনবার সুরা ইয়াসিন পড়েন। দ্বিতীয়বার পড়বার সময় অবাক হয়ে পুরো দলটাকে দেখলেন। এরা স্কুলঘরের দিকে যাচ্ছে।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত তিনি ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। সুরা ইয়াসিন শেষ করে দীর্ঘ সময় মসজিদের সিঁড়িতে বসে রইলেন। অন্ধকার এখনো কাটেনি। পাখপাখালি ডাকছে। ইমাম সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না—এখানে বসে থাকবেন, না খবর দেওয়ার জন্য ছুটে যাবেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে হলো, সিঁড়িতে এরকম প্রকাশ্যে বসে থাকা ঠিক না। মসজিদের ভেতরে থাকা দরকার। কিন্তু নীলগঞ্জ মসজিদে তিনি কখনো একা ঢোকেন না। এই মসজিদে জিন নামাজ পড়ে – এরকম একটা প্রবাদ আছে। অনেকেই দেখেছে। তিনি অবশ্য এখনো দেখেননি। কিন্তু তাঁর ভয় করে।

একা বসে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো, এই যে তিনি দেখলেন একদল মিলিটারি, এটা চোখের ভুল না তো? নান্দাইল রোডে মিলিটারি আসেনি, সোহাগীতে আসেনি—এখানে আসবে কেন? এখানে আছেটা কী? নেহায়েতই গণ্ডগ্রাম।

ইমাম সাহেব ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। ঝুলঘর বাঁশবনের আড়ালে পড়েছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মুসল্লিরা কেউ আসছে না কেন? নাকি মিলিটারির খবর জেনে গেছে সবাই? তাঁর প্রবল ইচ্ছে হতে লাগল নামাজ না—পড়েই ঘরে ফিরে যেতে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে অথচ কারও দেখা নেই।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবার পর মতি মিয়াকে আসতে দেখা গেল। মতি মিয়া একটা মামলায় জড়িয়ে ইদানীং ধর্মকর্মে অতিরিক্ত রকমের উৎসাহী হয়ে পড়েছে। ইমাম সাহেব নিচুগলায় বললেন, ‘এই মতি, কিছু দেখলো?’

‘কী দেখলো? কিসের কথা কন?’

‘কিছু দেখে নাই?’

‘না। বিষয়টা কী?’

ইমাম সাহেব আর কিছু না বলে চিন্তিত ভঙ্গিতে আজান দিতে গেলেন। আজান শেষ করে মতি মিয়াকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইজ্জতের কাছে কিছুই দেখে নাই?’

‘নাহ্। ব্যাপারটা কী ভাইজা কন।’

‘মনে হয় গেরামে মিলিটারি ঢুকছে।’

‘কী ঢুকছে?’

‘মিলিটারি।’

‘আরে কী কন? এই গেরামে মিলিটারি আইব ক্যান?’

‘আমি যাইতে দেখলাম।’

‘চউক্ষের ধাক্কা। আন্ধাইরে কী দেখতে কী দেখছেন। নান্দাইল রোডে তো এখন তক মিলিটারি আসে নাই।’

‘তুমি জানলো ক্যামনে?’

‘আমার শালা আইছে গতকাইল। নেজামের বড় ভাই।’

‘আমি কিন্তু নিজের চউক্ষে দেখলাম।’

‘আরে না। মিলিটারি আইলে এতক্ষণে গুলি শুরু হইয়া যাইত। মিলিটারি কি সোজা জিনিস?’

ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করবার আগেই আরও তিনজন নামাজি এসে পড়ল। তারাও কিছু জানে না। একজন এসেছে ঝুলঘরের সামনে দিয়ে, সেও কিছু দেখেনি।

ইমাম সাহেব আজ অত্যন্ত সংকীর্ণ নামাজ পড়লেন। নামাজের শেষে সাধারণত তিনি হাদিস-কোরআনের দুই-একটি কথা বলেন। আজ কিছুই বললেন না। বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বেশ আলো চারদিকে। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

জোড়া শিমুলগাছের কাছে এসে তিনি আড়চোখে ঝুলঘরের দিকে তাকালেন। বারান্দায় সারি সারি সৈন্য বসে আছে। ইমাম সাহেবের মনে হলো, ঝুল কম্পাউন্ডের গেটের কাছে দাঁড়ানো একটা লোক হাত ইশারা করে তাঁকে ডাকছে। লোকটির পরনে ফুল প্যান্ট এবং নীল রঙের একটা হাফ শার্ট। কিন্তু তাঁকে ডাকছে কেন? নাকি তিনি ভুল দেখছেন? ইমাম সাহেবের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। তিনি একবার আয়াতুল কুরসি ও তিনবার দোয়া ইউনুস পড়ে ঝুলঘরের দিকে এগোলেন।

নীল শার্ট পরা লোকটিও এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। ব্যাপার কী? এ কে? তিনি অতি দ্রুত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন—‘লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইল্লি কুনতু মিনাজ্জুরালিমিন।’ এই দোয়াটি খুব কাজের। হযরত ইউনুস আলায়হেস সালাম মাছের পেটে বসে এই দোয়া পড়েছিলেন।

‘নীল শার্ট পরা লোকটা এগিয়ে আসছে। কী চায় সে?’

‘আপনি কে?’

‘আমি এই গেরামের ইমাম।’

‘আচ্ছালামু আলায়কুম, ইমাম সাহেব।’

‘ওয়ারাইকুম সালাম ওয়ারাহমতুলাহ।’

‘আপনি একটু আসেন আমার সাথে।’

‘কই যাইতাম?’

‘আসেন। মেজর সাব আপনাকে ডাকেন। ভয়ের কিছু নাই, আসেন।’

ইমাম সাহেব তিনবার ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা আগে ফেললেন। সঙ্গে নীল শার্ট পরা লোকটি মৃদুস্বরে বলল, ‘এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ভয়ের কিছুই নাই।’

৪

আজিজ মাস্টারের অনিদ্রা রোগ আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত তাকে জেগে থাকতে হয় বলেই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাতে হয়। আজ তাকে ভোরের আলো ফোটার আগেই জাগতে হলো। কারণ ঝুলের দপ্তরি ও দারোয়ান রাসমোহন প্রচণ্ড শব্দে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, এফুনি আজিজ মাস্টারকে ঘর থেকে বের করতে হবে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আজিজ মাস্টার কথা বলল, ‘এই রাসমোহন, কী ব্যাপার?’

‘মিলিটারি। গেরামে মিলিটারি আসছে। ইঙ্কুলঘরে।’

‘কী বলছিস রাসমোহন?’

‘আপনারে স্যার ডাকে।’

আজিজ মাস্টার দরজা খুলে দেখল, রাসমোহনের থুতনি বেয়ে ঘাম পড়ছে। গানের ফতুয়াটাও ঘামে ভেজা। ঝুল থেকে দৌড়ে এসেছে বোধহয়। শব্দ করে শ্বাস টানছে। রাসমোহন আবার বলল, ‘মিলিটারি আপনারে ডাকে স্যার।’ আজিজ মাস্টার রাসমোহনের কথা মোটেও বিশ্বাস করল না। সময়টা খরাপ। খাকি পোশাকের একজন পিয়ন দেখলেও সবাই ভাবে পাঞ্জাবি মিলিটারি। রাসমোহনের রক্ততে সর্পভ্রম হয়েছে। থানাওয়ালারা কেউ এসেছে কেন্দুয়া থেকে। খুব সম্ভব চিত্রা বুড়ির ছেলের ব্যাপারে। মার্ভার কেইসে পুলিশের খুব উত্সাহ। দলবেঁধে চলে আসে। নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা আছে।

এখানেও তাই হয়েছে। আজিজ মাস্টার অনেকখানি সময় নিয়ে হাত-মুখ ধুল। তার মাথায় চুল নেই, তবু যত্ন করে চুল আঁচড়াল। পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে রাষ্ট্রায় বেরল। অর্ধেক পথ আসার পর তার মনে পড়ল চাবি ফেলে এসেছে। আবার ফিরে গেল চাবি আনতে। বাড়ি ফিরবার পথে সত্যি সত্যি বুঝল গ্রামে মিলিটারি এসেছে। মতি মিয়ার সঙ্গে তার দেখা হলো। রতন মাঝির সঙ্গে দেখা হলো। বাড়ি চুকবার মুখে জয়নাল মিয়াকেও ছাতা মাথায় দিয়ে আসতে দেখা গেল। রাসমোহন এদের প্রত্যেককে একবার একবার করে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল।

রাসমোহনের বর্ণনামতে, সে স্কুলঘরের বারান্দায় ঘুমাচ্ছিল। তখনো চারদিকে অন্ধকার। কে যেন তার পায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখে টর্চের আলো ফেলল। সে উঠে বসে দেখে জুলে মিলিটারি গিজগিজ করছে।

জয়নাল মিয়া নিচুগলায় বলল, 'আন্দাজ কতজন হইব?' 'চাইর-পাঁচশ'র কম না।'

'কও কী তুমি?'

'বেশিও হইতে পারে। সবটি মন্ত জোয়ান।'

'জোয়ান তো হইবোই। মিলিটারি দুবলা-পাতলা হয় নাকি?'

'হাতে অস্ত্রপাতি আছে?'

জয়নাল মিয়া বিরক্ত মুখে বলল, 'অস্ত্রপাতি তো থাকবোই। এরা কি বিয়া করতে আইছে?'

আজিজ মাস্টার গম্ভীর গলায় বলল, 'তারপর কী হয়েছে রাসমোহন?'

'তারা আমার নাম জিগাইল।'

আজিজ মাস্টার বলল, 'কোন ভাষায়, উর্দু না ইংরেজি?'

'বাংলায়। পরিষ্কার জিগাইল-তোমার নাম কী? তুমি কে? কী করো?'

'তা কীভাবে হয়? এরা তো বাংলা জানে না।'

'আমি স্যার পরিষ্কার ছনলাম। নিজের কানে ছনলাম।'

'তারপর বলো। তারপর কী হলো?'

'আমি কইলাম, আমার নাম রাসমোহন। আমি স্কুলের দপ্তরি। তখন তারা কইল, হেডমাস্টারেরে ডাইক্যা আনো।'

'বাংলায় বলল?'

'জি স্যার।'

'আরে কী যে বলে পাগল-ছাগলের মতো! এরা বাংলা জানে নাকি? কী শুনতে কী শুনেছ?'

আজিজ একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ করল তার হাত কাঁপছে। এবং প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। এফুনি হাঁপানির টান শুরু হবে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তার হাঁপানির টান ওঠে। এখন সিগারেট খাওয়াটা ঠিক হবে না জেনেও আজিজ মাস্টার লম্বা লম্বা টান দিতে শুরু করল। সে সাধারণত জয়নাল মিয়ার সামনে সিগারেট খায় না। জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি যাও মাস্টার, বিষয়টা কী জাইন্যা আস।'

'আমি, আমি কী জন্যে যাব?'

'আরে, ডাকতাহে তোমারে। তুমি যাইবা না তো যাইবোটা কে?'

আজিজ মাস্টারের সত্যি সত্যি হাঁপানির টান উঠে গেল। সিগারেট ফেলে দিয়ে সে লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে শুরু করল। জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'এরা এইখানে থাকবার জন্যে আসে নাই। বুঝলো? যাইতাহে অন্য কোনোখানে। ভয়ের কিছু নাই। একটা পাকিস্তানি পতাকা হাতে নিয়া যাও। একটা পতাকা আছে না? বাঁশের আগায় বান্ধ।'

‘আমি একলা যাব? বলেন কী?’

‘একসঙ্গে বেশি মানুষ যাওয়া ঠিক না।’

‘ঠিক-বেঠিক যাই হোক, আমি একা যাব না।’

‘এই রকম করতাই কেন মাস্টার, এরা বাঘও না, – ভালুকও না?’

‘একা যাব না। আপনারা চলেন আমার সাথে।’

সকাল প্রায় সাতটার দিকে ছজনের একটি ছোট্ট দলকে একটি পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে ইকুলঘরের দিকে আগাতে দেখা গেল। রোগা আজিজ মাস্টার দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে ইকুলঘরের কাছাকাছি এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, ‘পাকিস্তান!’ দলের অন্য সবাই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বলল, ‘জিন্দাবাদ!’

‘কায়দে আযম!’

‘জিন্দাবাদ!’

‘লিয়াকত আলী খান!’

‘জিন্দাবাদ!’

‘মহাকবি ইকবাল!’

‘জিন্দাবাদ!’

৫

রোদ উঠে গেছে।

বৈশাখ মাস-অল্প সময়েই রোদ বাঁজালো হয়ে ওঠে।

ছোট্ট দলটি, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে আজিজ মাস্টার, রোদে দাঁড়িয়ে ঘামছে। তাদের মুখ রক্তশূন্য। তারা বুকের মাঝে একধরনের কাঁপুনি অনুভব করছে।

রাস্তার ওপাশে চার-পাঁচটা জারুল গাছ। গাছের নিচে গেলে ছায়া পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া ঠিক হবে কি না আজিজ মাস্টার বুঝতে পারছে না। তারা জড়াজড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধ্বনি দেয়। আড়চোখে মিলিটারিদের দিকে তাকায়। সরাসরি তাকাতে সাহসে কুলায় না। সমস্ত বারান্দাজুড়ে মিলিটারিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ বসে আছে। কেউ মাথার নিচে হ্যাভারস্যাক দিয়ে ঘুমের মতো পড়ে আছে। ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে আসা দলটির প্রতি তাদের কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। তাদের দৃষ্টি সন্ন্যাসীদের মতো নির্লিপ্ত। যেন জগতের কোনো কিছুতেই তাদের কিছু আসে-যায় না।

পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটি মতি মিয়ার হাতে। সে হাত উঁচু করে ফ্ল্যাগটি দোলাচ্ছিল। হাত ব্যথা হয়ে গেছে, কিন্তু নামাবার সাহস হচ্ছে না। আজিজ মাস্টার খুকখুক করে কয়েকবার কাশল। সেই শব্দে বারান্দায় বসা কয়েকজন তাকাল তার দিকে। আজিজ মাস্টার প্রাণপণে কাশি চাপতে চেষ্টা করল। সময়টা খারাপ। এরকম সময়ে কাউকে অযথা বিরক্ত করা ঠিক না। কিন্তু ক্রমাগত কাশি উঠছে। আজিজ মাস্টার লক্ষ করল, উঠোনে চেয়ার পেতে যে অফিসারটি বসে আছেন তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

অত্যন্ত রূপবান একজন মানুষ। মিলিটারি পোশাকেও তাকে রাজপুত্রের মতো লাগছে। এর চোখে-মুখে কোনো ক্রান্তি নেই। তবে বসে থাকার ভঙ্গিটি শান্তির ভঙ্গি। তিনি তার সামনের টেবিলে পা তুলে দিয়েছেন। পায়ে খয়েরি রঙের মোজা। মানুষটি একাঙ, তবে সেই তুলনায় পায়ে পাতা দুটি ছোট।

তার কাছাকাছি যে রোগা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখতে বাঙালির মতো লাগছে। তার গায়ে চকচকে নীল রঙের একটা শার্ট। এই লোকটি খুব ঘামছে। ময়লা একটা ক্রমালে ক্রমাগত ঘাড় মুছেছে। অফিসারটি মৃদুস্বরে কী যেন বলল নীল শার্ট পরা লোকটিকে। নীল শার্ট পরা লোকটি তীক্ষ্ণগলায় বলল, ‘আপনাদের মধ্যে হেডমাস্টার সাহেব কে?’

আজিজ মাস্টারের বুকের মধ্যে শিরশির করতে লাগল।

‘কে আপনাদের মধ্যে হেডমাস্টার?’

মতি মিয়া আজিজ মাস্টারের পিঠে মৃদু ধাক্কা দিলো। আজিজ মাস্টার কাশির বেগ থামাতে থামাতে বলল, ‘জি আমি।’ ‘আপনি থাকেন। অন্য সবাইকে যেতে বলেন। যান ভাই, আপনারা সবাই যান। ভয়ের কিছুই নাই।’

আজিজ মাস্টার একা দাঁড়িয়ে রইল। অন্যরা মনে হলো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। তবে তারা চলেও গেল না। জুম্মাঘরের কাছে ছাতিম গাছের নিচে বসে রইল চুপচাপ। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাস্টার ফিরে না-আসা পর্যন্ত কিছু পরিষ্কার হবে না।

মতি বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। সে জয়নাল মিয়ার সামনে বিড়ি খায় না। এই কথা তার মনে রইল না। সময়টা খারাপ। এই সময় কোনো কিছু মনে থাকে না। ছোট চৌধুরীও সিগারেট ধরালেন। তিনি সকাল থেকেই ঘামছেন।

মতি মিয়া বলল, ‘ভয়ের কিছু নাই, কী কন?’

‘নাহ, ভয়ের কী? এরা বাঘও না ভালুকও না।’

‘একেবারে খাঁটি কথা।’

‘অন্যায় তো কিছু করি নাই। অন্যায় করলে একটা কথা আছিল।’

‘একেবারে খাঁটি কথা। অতি লেহ্য কথা।’

জয়নাল মিয়া উৎসাহিত বোধ করে। মতি বলল, ‘নীলু চাচার বাড়িত যাই, চলেন।’ কথাটা তার খুব মনে ধরে। কিন্তু আজিজ মাস্টার ফিরে না আসা পর্যন্ত নড়তেও ইচ্ছে করে না। রোদ চড়তে শুরু করে। ছাতিম গাছের নিচে একটি-দুটি করে মানুষ জমতে শুরু করে। সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। বাঁ-বাঁ করছে রোদ।

উত্তর বন্দে বোরো ধান পেকে আছে। কাটতে হবে। কিছু কিছু জমিতে পাট দেওয়া হয়েছে। খेत নিড়ানির সময় এখন। দক্ষিণ বন্দে আউশ বোনা হবে। কিন্তু আজ মনে হয় এ গ্রামের কেউ কোথাও যাবে না। আজকের দিনটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে সবাই অপেক্ষা করবে। এ গ্রামে বহুদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি।

বদিকে দেখা গেল ফর্সা জামা গায়ে দিয়ে হনহন করে আসছে। তার বগলে ছাতা। ছাতিম গাছের নিচে একসঙ্গে এতগুলো মানুষ দেখে হকচকিয়ে গেল।

‘বিষয় কী?’

মতি মিয়া ঠান্ডা গলায় বলল, ‘জানো না কিছু?’

‘কী জানুম?’

‘আরে মুসিবত! জান লইয়া টানাটানি, আর কিছুই জানো না?’

বদি চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না। জয়নাল মিয়া ঠান্ডা গলায় বলে, ‘গেরামে মিলিটারি আইছে।’

‘এইটা কী কন? এইখানে মিলিটারি আইব ক্যান?’

‘জুম্মাঘরে গিয়া নিজের চউক্ষে দেখ। আজিজ মাস্টারের রাইখ্যা দিছে।’

‘আঁ।’

‘আজ মধুবনে গিয়া কাম নাই, বাড়িত যাও।’

বদি রাস্তার ওপর বসে পড়ে। ফিসফিস করে বলে, ‘কী সর্বনাশ!’

জয়নাল মিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, ‘সর্বনাশের কী আছে? আমরা কী করলাম? কিছু করছি আমরা?’

বদি মুখ লম্বা করে বসে থাকে। একসময় মৃদুস্বরে বলে, ‘মুসলমানের জন্যে ভয়ের কিছু নাই। এরা মুসলমানদের খুব খাতির করে। তবে পাক্কা মুসলমান হওয়া লাগে। চাইর কলমা জিজ্ঞেস করে।’

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। চার কলমা কারও জানা নেই। বদি উৎসাহিত হয়ে বলে, ‘সুলত হইছে কি না এটাও দেখে। কাপড় খুইলা দেখে।’

‘তুমি জানলা ক্যামনে?’

‘নান্দাইল রোডে হনছি। সুলত না থাকলেই দুম। গুলি।’

‘কও কী তুমি?’

‘মিলিটারি মানুষ। রাগ বেশি। আমরা মতো না। রাগ উঠলেই দুম।’

বদি একটি বিড়ি ধরিয়ে দ্রুত টানতে থাকে। তার মধুবনে যাওয়া অত্যন্ত দরকার। কে জানে হয়তো মধুবনেও মিলিটারি এসে দোকানপাট জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে উঠে দাঁড়াল। মতি মিয়া বলল, ‘যাও কই?’ বদি তার উত্তর না দিয়ে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করল। ইকুলঘরকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। হাঁটতে হবে অনেক পথ।

কড়া রোদ উঠেছে। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। বদি হনহন করে ছুটেছে।

৬

রোগা নীল শার্ট পরা লোকটি বাঙালি।

সে আজিজ মাস্টারের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, ‘ইনি মেজর এজাজ আহমেদ, ইনারে সালাম দেন।’

আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মতো বলল, ‘স্লামালিকুম।’ মেজর এজাজ পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ‘আপনার নাম কী?’

জি, আমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক।’

‘সে ইট অ্যাগেইন।’

আজিজ মাস্টার নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে তাকাল। সে ঠান্ডা গলায় বলল, ‘নামটা আরেক বার বলেন। স্পষ্ট করে বলেন। গলায় জোর নাই?’

আজিজ মাস্টার বলল, ‘আজিজুর রহমান মল্লিক।’

‘আপনি বসুন।’

কোথায় বসতে বলছে? বসার দ্বিতীয় কোনো চেয়ার নেই। মাটিতে বসতে বলছে নাকি? আজিজ মাস্টারের গলা শুকিয়ে গেল। রোগা লোকটি ইকুলঘর থেকে একটি চেয়ার নিয়ে এলো। ঠান্ডা গলায় বলল, ‘বসেন। স্যার বসতে বলেছেন, বসেন।’ আজিজ মাস্টার সংকুচিত ভঙ্গিতে বসল। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বললেন না। সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল, ‘স্যার, ভালো আছেন?’ রোগা লোকটি বলল, ‘ওনেন ভাই, আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবেন না। যা জিজ্ঞেস করবে শুধু তার জবাব দিবেন। ইনি লোক ভালো, ভয়ের কিছুই নাই। স্যার বাংলা বলতে পারেন না, কিন্তু ভালো বোঝেন।’

‘জি আছে।’

‘আপনার ভয়ের কিছু নাই। আরাম করে বসেন।’

আজিজ মাস্টার আরাম করে বসার একটা ভঙ্গি করল। মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। প্যাকেটটি বাড়িয়ে দিলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। রোগা লোকটি বলল, ‘স্যার দিচ্ছেন যখন, নেন। বললাম না ইনি লোক ভালো।’ আজিজ মাস্টার একটা সিগারেট নিল। কী আশ্চর্য! মেজর সাহেব নিজে সিগারেটটি ধরিয়ে দিলেন। আজিজ মাস্টার তার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেল।

পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো। মেজর সাহেব প্রশ্ন করলেন ইংরেজিতে, আজিজ মাস্টার জবাব দিল বাংলায়। কিছু প্রশ্ন আজিজ মাস্টার বুঝতে পারল না। নীল শার্ট পরা লোকটি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলো।

‘তোমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক?’

‘জি স্যার।’

‘মল্লিক মানে কী?’

‘জানি না স্যার!’

‘এই গ্রামে কতজন মানুষ?’

‘জানি না স্যার।’

‘কতজন হিন্দু আছে?’

‘জানি না স্যার।’

‘তুমি দেখি কিছুই জানো না।’

‘স্যার, আমি বিদেশি মানুষ।’

‘বিদেশি মানুষ মানে? তুমি পাকিস্তানি না?’

‘জি স্যার।’

‘তাহলে তুমি বিদেশি হলে কীভাবে?’

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। আজিজ মাস্টারের মাথায় কোনো জবাব এলো না।

‘তুমি, ইকবাল জিন্দাবাদ বলছিলে, ইকবাল কে?’

‘কবি স্যার। বড় কবি। মহাকবি।’

‘তুমি তার কবিতা পড়েছ?’

‘জি না স্যার।’

‘পড় নাই—তীন ও আরব হামারা, সারা যাঁহা হ্যায় হামারা?’

‘জি না স্যার।’

মেজর সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। আজিজ মাস্টার লক্ষ করল, লোকটিকে দূর থেকে যত অল্পবয়স্ক মনে হচ্ছিল আসলে তার বয়স তত অল্প নয়। চোখের নিচে কালি। কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ। কত বয়স হতে পারে? পঁয়ত্রিশের কম নয়। আজিজ মাস্টারের বয়স আটত্রিশ। এই লোকটি তার চেয়ে তিন বছরের ছোট। অথচ এই লোকটির সামনে নিজেকে কেমন কেঁচোর মতো লাগছে। মেজর সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। পা থেকে মোজা জোড়া টেনে খুলে ফেললেন। আবার প্রশ্ন-উত্তর শুরু হলো।

‘এ-গ্রামে কোনো দুষ্ট লোক আছে?’

‘জি না, স্যার।’

‘মুক্তিবাহিনী আছে?’

‘জি না, স্যার।’

‘তুমি ঠিক জানো?’

‘জি স্যার। এই গ্রামের সবাইকে আমি চিনি।’

‘তোমার ধারণা, এই গ্রামে মুক্তিবাহিনী নেই?’

‘জি না।’

মেজর সাহেব মৃদু হাসলেন। কেন হাসলেন কে জানে। তিনি কি বিশ্বাস করছেন না? আজিজ মাস্টার আবার বললেন, ‘মুক্তিবাহিনী নাই স্যার।’

‘শেখ মুজিবের লোকজন আছে?’

‘জি না স্যার।’

‘তুমি জি না স্যার ছাড়া অন্যকিছু বলছ না কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ভয় পাচ্ছ তুমি?’

‘জি না স্যার।’

‘শুভ। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার দিকে ভালো করে তাকাও। তাকাও ভালো করে।’

আজিজ মাস্টার তাকাল। মেজর সাহেবের চোখ দুটি তার কাছে একটু নীলচে মনে হলো। বিড়াল চোখো নাকি?

‘আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি খারাপ লোক?’

‘জি না স্যার।’

‘কফি খাবে?’

আজিজ মাস্টার চোখ তুলে তাকাল। রোগা লোকটি বলল, ‘খেতে চাইলে বলেন, খাব। আমার দিকে তাকান কেন? অভ্যাস না থাকলে বলেন, খাব না। ব্যস। বারবার আমার দিকে তাকাবেন না।’

‘কি, কফি খাবে?’

‘জি না স্যার।’

‘না কেন, খাও, কফি তৈরি হচ্ছে। তুমি কি কফির সঙ্গে ক্রিম খাও?’

আজিজ মাস্টার না বুঝেই মাথা নাড়ল। কফি এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। অতি বিশ্বাস জিনিস। আজিজ মাস্টার চুক চুক করে কফি খেতে লাগল। কাপ নামিয়ে রাখার সাহস হলো না।

‘বুঝলে আজিজ, পাকিস্তানি মিলিটারির নামে আজগুবি সব গল্প ছড়ানো হচ্ছে। আমরা নাকি কোথায় কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে দুটি মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মেরেছি। গল্পটা তোমার বিশ্বাস হয়?’

আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না। মেজর সাহেব অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘আমরা কাঠুরী হলে সেটা করতাম। কিন্তু আমরা কাঠুরী নই, আমরা সৈনিক। আমরা গুলি করে মারব। ঠিক না?’

‘জি স্যার।’

‘হিন্দুস্থান বেতারে এসব প্রচার চালাচ্ছে, এবং অনেকেই এসব শুনছে। ঠিক না? বলা ঠিক বলছি কি না?’

‘জি স্যার, ঠিক।’

‘আজিজ মাস্টারের গলায় কফি আটকে গেল। তার আছে এবং সে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে।’

‘কি, আছে?’

‘জি স্যার।’

‘কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই শোন না।’

‘মাঝে মাঝে শুনি স্যার।’

‘শুনলেও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না। ঠিক না?’

‘মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয়।’

‘আজিজ!’

‘জি স্যার।’

‘তুমি একজন সৎলোক। অন্যকেউ হলে বলত বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় তুমি মিথ্যা একেবারেই বলতে পার না। আচ্ছা, এখন বলো, আর কার ট্রানজিস্টার আছে?’

‘নীলু সেনের আছে। জয়নাল মিয়ার আছে।’

‘ওরা কেমন লোক?’

‘ভালো লোক স্যার। নির্বিরোধী মানুষ। এই গ্রামে খারাপ মানুষ কেউ নেই।’

‘তাই নাকি?’

‘জি স্যার।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও। ভয়ের কিছু নাই।’

আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। তার মনে হলো মেজর সাহেব একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

‘শ্রামালিকুম স্যার।’

‘ওয়ালাইকুম সালাম।’

আজিজ মাস্টারের কেন যেন মনে হলো এক্ষুনি তাকে আবার ডাকা হবে। সে এগোতে লাগল খুব সাবধানে। কিন্তু কেউ তাকে ডাকল না। প্রায় ত্রিশ গজের মতো যাওয়ার পর সে ভয়ে ভয়ে একবার পেছনে তাকা-মেজর সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তার সঙ্গে রোপা লোকটিও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে। আজিজ মাস্টারের বুক ধক করে উঠল। কেন উঠল কে জানে। একবার পেছন ফিরে আবার মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া যায় না। আজিজ মাস্টার দ্বিতীয়বার বলল, ‘শ্রামালিকুম।’

মেজর সাহেব তখন তাকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, ‘এই যে মাস্টার সাহেব! এদিকে আসেন ভাই। স্যার ডাকেন।’ আজিজ মাস্টার ফিরে এল। মেজর সাহেব হাসিমুখে বললেন, ‘শুনলাম তুমি কবিতা লেখ।’ আজিজ মাস্টার বেকুবের মতো তাকাল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

‘এখানকার মসজিদের যে ইমাম সাহেব আছে, তার কাছে শুনলাম। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুমি কি সত্যি কবিতা লেখ?’

‘জি স্যার।’

‘বেশ। একটা কবিতা শোনাও। কবিতা আমি পছন্দ করি। শোনাও একটা কবিতা।’

আজিজ মাস্টার তাকাল নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে। সে শুকনো গলায় বলল, ‘স্যার শোনাতে বলছে, শোনান। চেয়ারে বসেন। বসে শোনান। ভয়ের কিছু নাই।’

আজিজ মাস্টার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন, 'বলো, বলো, সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। লেটেস্ট কবিতাটি বলো।'।

আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মতো চার লাইন বলে গেল—

'আজি এ নিশিথে তোমারে পড়িছে মনে
হৃদয়ে যাতনা উঠিছে জাগিয়া ক্ষণে ক্ষণে,
তুমি সুন্দর চেয়ে থাকি তাই কল্পলোকের চোখে
ভালোবাসা ছাড়া নাই কিছু আর মোর মরুময় বুকে।'

নীল শার্ট সেটি অনুবাদ করে দিলো। মেজর সাহেব বললেন, 'এটিই তোমার লেটেস্ট?'

'জি স্যার।'

'ভালো হয়েছে। বেশ ভালো। তা মেয়েটি কে?'

'জি স্যার?'

'কবিতার মেয়েটি কে? ওর নাম কী?'

'মালা।'

'মেয়েটি এখানেই থাকে?'

আজিজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। শুকনো গলায় বলল, 'এইখানেই থাকে।'

'তোমার স্ত্রী নাকি?'

'জি না স্যার। আমি বিয়ে করিনি।'

'এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাও?'

আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল। বলে কী এই লোক!

'কী বলো? চূপ করে আছ কেন? নাকি মেয়ের বাবা তোমার মতো বুড়োর কাছে বিয়ে দিতে চায় না?'

আজিজ মাস্টার খুকখুক করে কাশতে লাগল। নীল শার্ট তীক্ষ্ণগলায় বলল, 'স্যারের কথার জবাব দেন। স্যার রেগে যাচ্ছেন।'

মেজর সাহেব কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি খুশিখুশি।

'বলো, মেয়েটির বয়স কত?'

বয়স কম।'

'কত?'

'তেরো-চৌদ্দ।'

মেজর সাহেব হঠাৎ সুর পাল্টে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটি কার? আই মিন ওর বাবার নাম কী?' আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। মেজর সাহেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'শুধু শুধু দেরি করছ, বলে ফেল।' নীল শার্ট বলল, 'কেন শুধু শুধু রাগাচ্ছেন? বলে দেন না।'

'জয়নাল মিয়া'র মেয়ে। উনার বড় মেয়ে।'

‘যার বাড়িতে ট্রানজিস্টার আছে?’

আজিজ মাস্টার বেশ অবাক হলো। এই লোকটির আশিষ্ণু বৈশিষ্ট্য বেশ ভালো। মনে রেখেছে।

‘তুমি এখন আর আগের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলছ না। প্রতিটি প্রশ্ন দুবার করে করতে হচ্ছে। কারণ কী?’

আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না।

‘তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? বলো রাগ করেছ?’

‘না।’

‘এখন তুমি আর স্যার বলছ না কেন? নিশ্চয়ই তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।’

‘জি না স্যার।’

মেজর সাহেব অনেকখানি ঝুঁকে এলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। গলার স্বর নিচে নামিয়ে বললেন, ‘শোনো, ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আজ রাতে সম্ভব হবে না। আজ রাতে আমরা ব্যস্ত। কাল ভোরে। কী, তুমি খুশি তো?’

আজিজ মাস্টার তাকিয়ে রইল।

‘কী, কথা বলছ না যে? বলো, শুকরিয়া।’

‘শুকরিয়া!’

‘আমি কথার খেলাফ করি না। যা বলেছি তা করব। এখন তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও।’

মেজর সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। নিজে একটি ধরালেন। তাঁর চোখে এখন আর হাসি স্বিকমিক করছে না।

‘তোমাদের এই জঙ্গল মাঠে কী আছে?’

‘কিছু নাই। জঙ্গল।’

‘আমরা জানি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ কিছু জোয়ান এবং কয়েকজন অফিসার এখানে লুকিয়ে আছে।’

আজিজ মাস্টারের চোখ বড় হয়ে গেল।

‘ওরা আমাদের দুজন অফিসারকেও নিয়ে গেছে। একজন হচ্ছে আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার। ফুটবল প্রেয়ার।’

‘আমি কিছুই জানি না স্যার।’

‘কিছুই জানো না?’

‘জি না স্যার।’

‘আমি যতদূর জানি, এ গ্রাম থেকেই তো ওদের খাবার যাচ্ছে।’

‘আমি স্যার কিছুই জানি না।’

‘আমি ভাবছিলাম জানো।’

‘জানি না স্যার।’

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ হয়েছে আজিজ মাস্টারের। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'স্যার আমি যাই?'

মেজর সাহেব চোখ না খুলেই বললেন, 'সেটা কি ঠিক হবে? আমরা ওদের ধরতে এসেছি। এখন তোমাকে যেতে দিলে খবরটা ওদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। পারে না?'

আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল।

'তুমি ঐ ঘরে আজ রাতটা কাটাও। আমরা অপারেশন শুরু করব বিকেলের দিকে। আরেকটি বড় কোম্পানি আসবে আমাদের সাহায্য করতে। ওদের জন্যই অপেক্ষা করছি।'

আজিজ মাস্টারের হাঁপানির টান উঠে গেল। টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগল। মেজর সাহেব হালকা গলায় বললেন, 'তোমাকে অনেক গোপন খবর দিয়ে দিলাম। তবে অসুবিধা নেই, তুমি বন্ধু-মানুষ, যাও, ঐ ঘরে চলে যাও।'

'স্যার, আমি কিছুই জানি না।'

'জানো না সে তো আগেই বলেছ। সবাই কি আর সবকিছু জানে? জানে না। যাও, ঐ ঘরে গিয়ে বসে থাকো।' রোদ থেকে এসেছে বলেই কি না কে জানে, এই পরিচিত ঘরও আজিজ মাস্টারের কাছে অচেনা লাগতে লাগল। অথচ এটা টিচার্স রুম। আজিজ মাস্টার রোজ এখানে বসে।

'মাস্টার সাব!'

'কে?'

আজিজ মাস্টার অবাক হয়ে দেখল একটা চেয়ারে ইমাম সাহেব জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন। ইমাম সাহেবের নাক-মুখ ফুলে গেছে। নিচের ঠোঁটটি কেটে গেছে। তাঁর সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের ছোপ। কাটা ঠোঁট দিয়ে হলুদ রক্তের রস বেরুচ্ছে। আজিজ মাস্টার দীর্ঘ সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল এবং নিজের অজান্তেই এক সময় তার প্রস্রাব হয়ে গেল।

ইমাম সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। মেঝেতে প্রস্রাব গড়াচ্ছে। তাঁর কোনো ভাবান্তর হলো না।

৭

দিনের বেলা মীর আলির কাজ হচ্ছে পরীবানুকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে থাকা। পরীবানুর বয়স তিন। দাদাকে সে খুবই পছন্দ করে। মীর আলিও জগতের অনেক জটিল বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। মীর আলির কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সে পরীবানুর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

আজ ভোরবেলাও সে নাতনিকে কোলে নিয়ে মুড়ি খেতে বসেছিল। দাঁত না থাকায় মুড়ি চিবোতে পারে না। একগাল মুড়ি নিয়ে তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। ঘরে আম আছে। একটা পাকা আমের রস, মুড়ির বাটিতে ঢেলে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়। অনুফল সেটা করবে না। যদি বাড়িতে না থাকলে সে তার শ্বশুরের খাওয়াদাওয়ার দিকে তেমন নজর দেয় না।

আজ তার চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ঘরে চায়ের পাতা আছে, গুড় আছে। যদি এনে রেখেছে। তার বাবার জন্যই এনেছে। তিনি নিজের কানে শুনেছেন, যদি বলছে- 'বাজানরে মাঝে মধ্যে দিও। বুড়া মানুষ। চায়ে কাশির আরাম হয়।'

মীর আলি প্রতিদিন ভোরেই বেশ সাড়ম্বরে খানিকক্ষণ কাশে, যাতে অনুফার চায়ের কথাটা মনে পড়ে। বেশির ভাগ দিনই তার মনে পড়ে না। আজও হয়তো পড়বে না। তবু সে কাশতে লাগল। কাশতে কাশতেই পরীবানুকে বলল, 'চা হইল সর্দিকাকশের বড় ওষুধ। বুঝছস পরী?'
পরী উত্তর দিলো না।

'বড় জামবাটির এক বাটি চা যদি সকালে খায় কেউ, তা হইলে সর্দিকাকশি, বাত সব যায়। চা-টা খুব বড় ওষুধ।' মীর আলির জন্য আজ দিনটি সম্ভবত খুব শুভ। কারণ অনুফা তাকে এক বাটি চা এনে দিলো। সেই চায়ে তেজপাতা দেওয়ায় বেশ সুন্দর একটা গন্ধ। অভিভূত হয়ে পড়ল মীর আলি।

'মিষ্টি হইছে কি না দেখেন।'

'হইছে গো বেটি, হইছে। জবর বালা হইছে।'

অনুফাকে দু-একটা সুন্দর সুন্দর কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কী বললে সে খুশি হয় তা মীর আলির জানা নেই।

'মুড়ি চায়ের মইধ্যে ভিজাইয়া চামুচ দিয়া খান। চামুচ দিতাছি।'

মীর আলি অনুফার প্রতি বড় মমতা বোধ করল। সংসারের আয়-উন্নতি যা হচ্ছে এই মেয়েটির কারণেই হচ্ছে। ঘরে এখন চামুচ আছে। নতুন সাইকেল আছে। গত বৎসর যদি তাকে লেপ বানিয়ে দিয়েছে। বলতে গেলে গত শীত কোন দিকে গিয়েছে বুঝতেই পারা যায়নি। অথচ বদিকে বিয়ে করানোর আগে কী হাল ছিল সংসারের! সব ভাগ্য! একেকজনের একেকরকম ভাগ্য। অনুফা এ সংসারে ভাগ্য নিয়ে এসেছে। মীর আলি ভাবতে চেষ্টা করল, অনুফা এ বাড়িতে আসার পর তারা কি কখনো একবেলা না খেয়ে থেকেছে? না। নীলগঞ্জের এককম ভাগ্য কয়জনের আছে? অথচ কত ঝামেলা বদির বিয়েতে। শেষ মুহূর্তে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। বদির মামা বলল, 'এই মেয়ের মা নাই। জামাইয়ের কোনো আদর হইত না।' কথা খুবই সত্য। কিন্তু বিয়ের কথা ঠিকঠাক হবার পর বিয়ে ভেঙে দেওয়াটা ঠিক না।

মনে খুঁতখুঁতানি নিয়ে সে ছেলে নিয়ে গেল। কী বাড়ি বিয়ের রাতে! লগুভগু অবস্থা। দুপুর-রাতে ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখল, ঝড়ে গ্রামে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। শুধু তার ঘরটি পড়ে গেছে। কী অলক্ষণ!

'দাদা, চা দেও।'

'পুলাপান মাইনষের চা খাওন নাই।'

'চা দেও, দাদা।'

মীর আলি হাঁক দিলো-বৌমা, আরেকটা বাটি দেও। এই সময় এক ঝাঁক গুলি হলো। হালকা মেশিনগানের কানে তালা-ধরানো ক্যাট ক্যাট শব্দ। পরীবানু আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। মীর আলি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চায়ের বাটি উল্টে ফেলল পরীবানুর পায়ে।

নীলগঞ্জ গ্রামে ছোট্ট ছোট্ট শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় একটা সৈন্যদল এসে ঢুকল। তারা ঢুকল মার্চ করে। গর্বিত ভঙ্গিতে। তাদের সঙ্গে আছে চল্লিশজন রাজাকারের একটি দল। তালে তালে গা ফেলবার একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করছে তারা। দলটি অনেক দূর থেকে আসছে। এদের চোখে-মুখে ক্লান্তি। হয়তো সারারাত ধরেই হাঁটছে, কোথাও বিশ্রাম করেনি।

বদিউজ্জামান হনহন করে হাঁটছিল। হাঁটা না বলে একে দৌড়ানো বলাই ঠিক হবে। কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় রাস্তাঘাট শুকনো। দ্রুত হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। তার একমাত্র চেষ্টা কত তাড়াতাড়ি মধুবন বাজারে গিয়ে পৌঁছানো যায়। মাঝামাঝি পথে সে মত বদলাল—ফিরে চলল নীলগঞ্জের দিকে। যা হবার হোক, এই সময় বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া ঠিক না। জঙ্গল মাঠের কাছাকাছি আসতেই সে দ্বিতীয় মিলিটারি দলটিকে দেখতে পেল। ওরা আসছে উত্তরদিক থেকে। বদিউজ্জামান উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল জঙ্গল মাঠের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচু একটা গর্তে। সেখানে এক-কোমর পানি। তাকে কেউ সম্ভবত দেখতে পায়নি। বদিউজ্জামান এক-কোমর পানিতে ঘন্টাখানেক বসে রইল। মিলিটারিদের এই সময়ের মধ্যে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এরা যাচ্ছে না কেন? কিছুক্ষণ পর খুব কাছেই ওদের কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। এর মানে কী?

বদিউজ্জামান মাথা উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করল। চোখের ভুল কি না কে জানে। তার মনে হলো, মিলিটারিরা জঙ্গল মাঠ ঘিরে বসে আছে। বদিউজ্জামান গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে একটা মোরতা ঝোপের আড়ালে মাথা ঢেকে রাখল। মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। কিন্তু পানি বেশ ঠান্ডা। বদিউজ্জামানের শীত শীত করতে লাগল। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে? গা কুটকুট করছে। সবুজ রঙের একটা গিরগিটি চোখ বড় বড় করে তাকে দেখছে। বদিউজ্জামান হাত ইশারা করে তাকে সরে যেতে বলল। রোদ বাড়ছে। ক্রমেই বাড়ছে। পচা গন্ধ আসছে পানি থেকে। পাট পচানোর গন্ধের মতো গন্ধ। গিরগিটিটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। বদিউজ্জামান মৃদুস্বরে বলল, যা হোস। আর তখনই নীলগঞ্জের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ আসতে লাগল। কী ব্যাপার?

জয়নাল মিয়া তার দলবল নিয়ে দীর্ঘ সময় ছাতিম গাছের নিচে অপেক্ষা করল। আজিজ মাস্টার ফিরে এলো না। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায়? রাসমোহন কয়েকবার বাঁশঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে। আজিজ মাস্টার চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ আগে সে এসে বলল, আজিজ মাস্টারকে আর দেখা যাচ্ছে না। এর মানেটা কী? জয়নাল মিয়া বলল, ‘বিষয়টা কী রাসমোহন?’ রাসমোহন শুকনো মুখে বসে রইল।

‘মাইরা ফেলেছে না কি?’

‘মারলে গুলির শব্দ হইত। গুলি তো হয় নাই।’

‘তাও ঠিক।’

জয়নাল মিয়া মতি মিয়ার কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরাল। তার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। আর তখন মতি মিয়ার পাগল শালা নিজামকে আসতে দেখা গেল। তার মুখ হাসি-হাসি। পাগলামির অন্য কোনো লক্ষণ নেই। মতি মিয়া ধমকে উঠল, ‘কই গেছিলো?’

নিজামের হাসি আকর্ষণ বিজ্ঞত হলো। ঠিক তখন গুলি ছুড়তে ছুড়তে মিলিটারি ও রাজাকারের দ্বিতীয় দলটি গ্রামে উঠে এলো। জয়নাল মিয়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল দক্ষিণ দিকে। বাকিরাও তাকে অনুসরণ করল। নিজাম শুধু মুখটা হাসি-হাসি করে দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত ব্যাপারটিতে সে বড় মজা পাচ্ছে।

৮

ইমাম সাহেব এক সময় বললেন, 'দোয়া ইউনুসটা দমে দমে পড়েন মাস্টার সাব।' আজিজ মাস্টার তাকাল তার দিকে, তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হয় সে কিছুই বুঝতে পারছে না। গত তিন ঘণ্টা যাবৎ এই দুটি মানুষ একসঙ্গে আছে। এই তিন ঘণ্টায় তাদের কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়নি। আজিজ মাস্টার তার পায়জামা ভিজিয়ে ফেলার পর থেকেই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছে না।

'হযরত ইউনুস আলায়হেস সালাম মাছের পেটে এই দোয়া পড়তেন। এর মরতবাই অন্য। দোয়াটা জানেন?' আজিজ মাস্টার মাথা নাড়ল। সে জানে। কিন্তু ইমাম সাহেবের মনে হলো সে কিছুই পড়ছে-টুড়ছে না। বসে আছে নির্বোধের মতো।

'মাস্টার সাব!'

'জি।'

'আমাদের সামনে খুব বড় বিপদ।'

'কেন?'

'বুঝতে পারতেছেন না?'

'না।'

'এরা কী জন্যে আসছে সেটা বলেছে?'

'হুঁ।'

'তবু বুঝতে পারতেছেন না?'

'না।'

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। আজিজ মাস্টার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। এখান থেকে সৈন্যদলের একটা অংশ দেখা যায়। কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে, কাগজের একটা বল বানিয়ে ছুড়ে ছুড়ে মারছে এবং ক্রমাগত হাসছে। কাগজের একটা বল ছুড়ে মারার মধ্যে এত আনন্দের কী আছে কে জানে?

স্কুলঘরটি টিনের। রোদে টিন তেতে উঠেছে। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। আজিজ মাস্টারের পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। শুধু তৃষ্ণা নয়, ক্ষুধাও বোধ হচ্ছে। বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষুধা হওয়ারই কথা। অন্য সময় এত দেরি হলে মালা খোঁজ নিত, 'মামা, ভাত বাড়ছে, আসেন।' বলেই সে চলে যেত না। দরজা ধরে ঐক্যবাক্যে দাঁড়াত। যেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

গতবার ময়মনসিংহ থেকে মালার জন্য একটা আয়না কিনেছিল আজিজ মাস্টার। খুব বাহারি জিনিস। দুটো আয়না পাশাপাশি। একটি সাধারণ আয়না, অন্যটি অন্যরকম। সেটায় মুখ অনেক বড় দেখা যায়। আয়নাটা দেওয়া ঠিক হবে কি না তা নিয়ে আজিজ মাস্টার প্রায় এক সপ্তাহ ভাবল। কেউ কিছু মনে করে বসতে পারে। তাহলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

কেউ কিছু মনে করল না। মালা অভিভূত হয়ে পড়ল। একটা আয়নায় মুখ বড় দেখায় কেন এই প্রশ্ন কয়েকবার করা হলো। এমনকি মালার মা একদিন পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করে ফেসল, 'মুখ বড় দেখালে কী লাভ?' আজিজ মাস্টার লাজুক স্বরে বলেছিল, 'সাজগোজের সুবিধা হয় ভাবি।'

‘কী সুবিধা?’

কী সুবিধা সেটি আর ব্যাখ্যা করতে পারেনি। কারণ এটা আজিজ মাস্টারেরও জানা ছিল না।

ইমাম সাহেব নড়েচড়ে বসলেন।

‘মাস্টার সাব!’

‘বলেন।’

‘জোহর নামাজের ওয়াক্ত হইছে না?’

‘জানি না।’

‘নামাজটা পড়া দরকার। বের হয়ে ওদের কাছে পানি চাব? অজু নাই আমার।’

‘দেখেন আপনি চিন্তা করে।’

‘আপনি তো আর নামাজ পড়তে পারবেন না। শরীর নাপাক। গোসল লাগবে। পেশাব করে দিয়েছেন তো।’

আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না। ইজি চেয়ারটিতে চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে পড়ে রইল। ইজি চেয়ারটি নীলু সেনের। শুয়ে থাকতে বড় আরাম।

‘মাস্টার সাব। পানি চাইব নাকি?’

‘আপনার ইচ্ছা হলে চান।’

‘এর মধ্যে তো দোষের কিছু নেই। এরাও মুসলমান।’

‘হুঁ।’

‘নামাজের পানি চাইলে এরা খুশিই হবে। পাক্কা মুসলমানদের এরা খুব পেয়ার করে। এরাও তো সাচ্চা মুসলমান।’

‘যান না। গিয়ে চান।’

‘ভয় লাগে।’

‘ভয়ের কী আছে?’

ইমাম সাহেব নড়েন না। জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারেই বসে থাকেন। চোখ বন্ধ করে ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকতে থাকতে আজিজ মাস্টারের ঝিমুনি আসে। ঝিমুতে ঝিমুতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ে। এর মধ্যেই ছাড়া ছাড়া বেশ কয়েকটি স্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারে এগুলো স্বপ্ন। তবু তার ভালোই লাগে।

ইমাম সাহেব বিরক্তমুখে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। এ কেমন মানুষ-ঘুমিয়ে পড়েছে! তিনি মৃদুস্বরে ডাকেন, ‘এই যে মাস্টার সাব! এই!’ আজিজ মাস্টার নড়েচড়ে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না।

নীলু সেন গত রাতে এক পলকের জন্যও ঘুমুতে পারেনি। দোতলার যে-ঘরটিতে তাঁর বিছানা সে-ঘরের বারান্দায় গড়াগড়ি করেছে। নীলু সেনের বোন-পো বলাই চোখ বড় বড় করে মামার অবস্থা দেখেছে। রাত দুটোর দিকে বলাই ঠিক করল, মামার জন্য ডাক্তার আনতে সরাইল বাজারে যাবে। পথঘাট এখন শুকনো। বদিউজ্জামানের সাইকেল নিয়ে যাওয়া যাবে। নীলু সেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ‘এতক্ষণ বাঁচব না রে বলাই, এতক্ষণ বাঁচব না।’ বলাইয়েরও তাই ধারণা হলো। এত কষ্ট সহ্য করে কেউ দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়।

‘ব্যথাটা কোথায়?’

‘তলপেটে।’

বলাই দ্বিতীয় প্রশ্নের সময় পেল না। নীলু সেনের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুতে লাগল। সময় শেষ হয়েছে বোধহয়। এতবড় বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী। বলাইয়ের ভয় করতে লাগল। কী সর্বনাশ! এ কী বিপদ!

‘মামা, গ্রামের দুই-একজন মানুষেরে ডাক দিয়া আনি?’

‘তুই নড়িস না। আমার সময় শেষ।’

বলাই মামার হাত ধরে বসে রইল। তার কাছে মনে হলো, মামার গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। বলাই ঘামতে লাগল। কিন্তু শেষ রাত্রে হঠাৎ ব্যথা কমে গেল। নীলু সেন শান্তস্বরে বলল, ‘ব্যথা নাই। বলাই, ঠান্ডা পানি দে এক গ্লাস।’

বলাই পানি এনে দেখে মামা মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। বড় মায়া লাগে দেখে।

গ্রামে মিলিটারি আসার এতবড় একটা খবরেও বলাই তাঁর ঘুম ভাঙল না। আহা বেচারি, ঘুমাক!

নীলু সেনের ঘুম ভাঙল মিলিটারির। ডাকাডাকি, হইচই শুনে নীলু সেন দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বের করল। কী ব্যাপার? নীলশার্ট পরা একটি লোক বলল, ‘আপনার নাম কি নীলু? নীলু সেন?’

‘জে আজে।’

‘আপনার বাড়িতে আর কে আছে?’

‘বলাই। আমার বোন-পো বলাই। আপনারা কে?’

‘বলাইকে নিয়ে নিচে নেমে আসেন।’

নীলু সেন বলাইকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। গায়ে একটা পাতলা সুজনি চড়িয়ে নিচে নেমে এলেন। ভারী দরজা খুলতে সময় লাগল। বাইরে থেকে অসহিষ্ণু কণ্ঠে কে যেন বলল, ‘এত সময় লাগছে কেন?’

নীলু সেন কিছুই বুঝতে পারছে না। তাঁর ঘুমের ঘোরও বোধহয় ভালোমতো কাটেনি। সে দরজা খুলে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, ‘আদাব।’

তার কথা শেষ হবার আগেই চার-পাঁচটা গুলির শব্দ হলো। নীলু সেন কাত হয়ে পড়ে গেলেন দরজার পাশে। কোনো চিৎকার না। নিঃশব্দ মৃত্যু। নীল শার্ট পরা লোকটি ডাকল, ‘বলাই! বলাই!’

৯

বদিউজ্জামান মাথা নিচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল। ভূষণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। তার মনে হলো, পায়ে আর কোনো বোধশক্তি নেই। মাথা কেমন যেন করছে। গিরগিটিটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। এর চোখ দুটি মানুষের মতো। মনে হয় হাসছে। বুড়ো মানুষের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে হাসা। সে হাত ইশারা করে গিরগিটিটাকে বিদেয় করতে চাইল। কিন্তু সে যাচ্ছে না, তাকিয়ে আছে।

আচ্ছা, মিলিটারিদের সম্পর্কে যেসব গল্প শোনা যায় সেগুলি সত্যি? শুধু শুধু এরা মানুষ মারবে কেন? এরা নাকি নতুন কোনো জায়গায় গেলেই প্রথম ধাক্কাই চল্লিশ-পঞ্চাশজন মানুষ মেরে ফেলে ভয় দেখাবার জন্য? এটা একটা কথা হলো? সব গুজব। এরাও তো আল্লাহর বান্দা। মিলিটারিও মানুষ, রক্ত একটু গরম এই আর কী। এটা তো দোষের কিছু না। পোশাকটাই এরকম। গায়ে দিলে রক্ত গরম হয়ে যায়।

বদিউজ্জামান খুকখুক করে দুবার কাশল। নিজের কাশির শব্দে নিজেই চমকে উঠল। কেমন বেকুবের মতো কাণ্ড করছে। নির্জন জায়গা। অল্প শব্দ হলেই অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আবার কাশি আসছে। বদিউজ্জামান কাশি সামলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘড়ঘড় একটা শব্দ বের করল। গিরগিটিটা ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছে। না, যাচ্ছে না। আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। পানি খেতে এসেছে বোধহয়। তাকে দেখে পানি খাবার সাহস হচ্ছে না, আবার তৃষ্ণা নিয়ে চলেও যেতে পারছে না।

বদির আবার তৃষ্ণা বোধ হলো। সে মাথা নিচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল।

১০

নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, 'আপনারা দুজন আসেন আমার সঙ্গে।' আজিজ মাস্টার তাকাল ইমাম সাহেবের দিকে। ইমাম সাহেব ভীতস্থরে বললেন, 'কোথায়?' নীল শার্ট পরা লোকটির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তাকে কোনো প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করার সাহস হয় না। তবু ইমাম সাহেব দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?'

'বিলের কাছে।'

'কেন?'

'মেজর সাহেব নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কী জন্যে?'

'এত কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। আপনারা ওঠেন। মেজর সাহেব অপেক্ষা করছেন।'

'বড় ভয় লাগতেছে ভাই।'

'ভয়ের কিছু নাই, আসেন।'

আজিজ মাস্টার একটি কথাও বলল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো। সবার শেষে বেরলেন ইমাম সাহেব। তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।

স্কুলঘরের বারান্দায় কেউ নেই। ধু-ধু করছে চারদিক। বসে থাকা সেপাইরা কখন গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে কে জানে। ঘরের ভেতরে বসে কিছুই বোঝা যায়নি। হয়তো কোনো পাহারা-টাহারা ছিল না। ইচ্ছে করলেই পালিয়ে যাওয়া যেত। ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এরা সব কোথায় গেল?'

নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, 'বেশি কথা বলবেন না। আপনারা মৌলবি মুসল্লিরা বেশি কথা বলেন আর ঝামেলার সৃষ্টি করেন। কম কথা বলবেন।'

'জি আচ্ছা।'

ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক পর্যন্ত তারা এগোল নিঃশব্দে। জুম্মাঘরের পাশে আট-নয়জন সেপাইয়ের একটি দল দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ইমাম সাহেবের ঘনখন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তিনি নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, 'ভাই, আপনার নাম কী?'

'রফিক।'

'রফিক সাহেব, আমার জোহরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে। পানির অভাবে অজু করতে পারি নাই।'

রফিক তার কোনো জবাব দিলো না। আগে আগে হাঁটতে লাগল। কোথাও কোনো মানুষজন নেই। গ্রামের সবাই কি ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে নাকি? ইমাম সাহেব বললেন, 'ভাই, আপনার দেশ কোথায়? বাড়ি কোন জিলায়?'

‘বাড়ি দিয়ে কী করবেন?’

‘না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমার দেশ কুমিল্লা। নবীনগর।’

‘ভালো।’

‘সামনের মাসে ইনশাল্লাহ দেশে যাব। বহুত দিন যাই না।’

রফিক কিছুই বলল না। সে হাঁটছে মাথা নিচু করে। এমনভাবে হাঁটছে যেন পথঘাট ভালো চেনা। কিন্তু এ লোকটি এই গ্রামে আগে কখনো আসেনি। আজিজ মাস্টার বলল, ‘মেজ সাহেব কেন ডেকেছেন আপনি জানেন?’

‘জানি।’

‘জানলে আমাদের বলেন।’

রফিক নিম্পৃহ স্বরে বলল, ‘একটা অপরাধীর বিচার হবে। গুর নাম মনা। সে খুন করেছে। সেই খুন নিয়ে কোনো থানা-পুলিশ হয়নি। এক বুড়ি নালিশ করেছে মেজর সাহেবের কাছে। ঐ বুড়ির নাম চিত্রা বুড়ি।’

ইমাম সাহেব বললেন, ‘চিত্রা বুড়ি! খুব বজ্জাত। মসজিদের একটা বদনা চুরি করেছে।’

‘বদনা চুরি করুক আর না করুক, মেজর সাহেব তার কথা শুনে খুব রাগ করেছেন। মনাকে ধরা হয়েছে। কঠিন শাস্তি হবে।’

আজিজ মাস্টার ক্ষীণস্বরে বলল, ‘কী শাস্তি?’

‘মিলিটারিদের তো আর জেল-হাজত নাই যে জেলে ঢুকিয়ে দেবে! ওদের শাস্তি একটাই। ছোট অপরাধের জন্য যে শাস্তি, বড় অপরাধের জন্যও সেই শাস্তি।’

‘কী সেটা?’

‘বুঝতেই তো পারছেন, আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?’

ইমাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, ‘আমরা গিয়ে কী করব?’

‘আপনারা শাস্তি দেখবেন।’

‘শাস্তি দেখব?’

‘হ্যাঁ। এর দরকার আছে।’

‘কী দরকার?’

‘মেজর সাহেবের ধারণা, এটা দেখার পর আপনারা তার কথা শুনবেন। কোনোকিছু জিজ্ঞেস করলে সোজাসুজি জবাব দেবেন।’

‘ও।’

‘শুনেন ইমাম সাহেব, আপনি কথা বেশি বলেন। কথা বেশি বলে একবার মার খেয়েছেন। কথা খুব কম বলবেন।’

‘জি আচ্ছা।’

‘নিজের থেকে কোনো কথা বলবেন না। এখন সময় খারাপ।’

‘জি, তা ঠিক।’

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন।

মীর আলি বাড়ির উঠোনে বসে ছিল। আজ বাড়িতে রান্না হয়নি। খিদের যজ্ঞণায় সে অস্থির হয়ে পড়ল। এই বয়সে খিদে সহ্য হয় না। অনুফাকে কয়েকবার ভাতের কথা বলাও হয়েছে। কিন্তু অনুফা কিছুই করছে না। সে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। ভাত রাঁধায় তার মন নেই। ভয় মীর আলিরও লাগছে। কিন্তু খিদের কষ্ট বড় কষ্ট।

আজিজ মাস্টাররা তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সে একথালা মুড়ি নিয়ে বসেছিল। এই বয়সে মুড়ি চিবোতে কষ্ট হয়, তবু চিবোতে হয়। যা ভাবসাব তাতে মনে হচ্ছে, আজ আর রান্না হবে না। পায়ের শব্দে মীর আলি চমকে উঠে বলল, 'কেডা যায়?'

'আমি আজিজ। আজিজ মাস্টার।'

'তোমার সঙ্গে কেডা যায়?'

'আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না।'

'কথা কও না যে, ও মাস্টার! মাস্টার!'

রফিক বলল, 'দাঁড়াবেন না, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ও মাস্টার, কে কথা কয়?'

রফিক শীতল স্বরে বলল, 'আমার নাম রফিক। চাচা মিয়া, আপনি ঘরের ভেতরে গিয়ে বসেন।'

'মাস্টার, এই লোকটা কে? মিলিটারি?'

'না। আমি মিলিটারি না।'

'আপনার বাড়ি কোন গ্রাম?'

রফিক তার জবাব দিলো না। হাঁটতে শুরু করল। ইমাম সাহেব তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছেন না। ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন। তার জন্য দুজনকেই মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হচ্ছে। রফিক বলল, 'হাঁটতে কষ্ট হলে আমার হাত ধরে হাঁটেন।'

'জি না। কোনো কষ্ট নাই।'

'লজ্জার কিছু নাই। আমার হাত ধরে হাঁটেন।'

'শুকরিয়া! ভাই আপনার বয়স কত?'

'আমার বয়স দিয়ে কী করবেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

'আপনাকে তো বলেছি বিনা প্রয়োজনে কথা বলবেন না।'

'জি আচ্ছা।'

'আমার বয়স তিরিশ।'

রফিককে দেখে বয়স আরও বেশি মনে হয়। রোগা এবং লম্বা। ছোট ছোট চোখ। কথা বললে চোখ আরও ছোট হয়ে যায়। মনে হয় লোকটি যেন চোখ বন্ধ করে কথা বলছে।

ইমাম সাহেব দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইল্লি কুনতু মিনাজ্জুয়ালেমিন।

মনা কৈবর্ত তার এগারো বছরের ভাইকে নিয়ে তেঁতুল গাছের নিচে চুপচাপ বসে আছে। মনার শরীর বিশাল, প্রায় দৈত্যের মতো। তার ভাইটি অসম্ভব রোগা। সে মনার লুঙ্গির এক প্রান্ত শক্ত করে ধরে আছে। তাকাচ্ছে সবার মুখের দিকে। বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনাকে খুব একটা বিচলিত মনে হচ্ছে না।

মেজর সাহেব প্রায় দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তার সঙ্গে একজন নন-কমিশন্ড অফিসার। এরা দুজন নিচুগলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। মেজর সাহেব সম্ভবত কোনো রসিকতা করলেন। দুজনেই উচুগলায় হাসতে শুরু করলেন। মনার ভাইটি চোখ বড় বড় করে তাকাল তাদের দিকে। বিলের পাড়ের উঁচু জায়গায় একদল রাজাকার দাঁড়িয়ে। খুব কাছেই মিলিটারি আছে বলেই হয়তো তারা বুক ফুলিয়ে আছে। অহংকারী গর্বিত ভঙ্গি। এদের মধ্যে শুধু দুজনের পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। বাকি কারো পায়ে কিছু নেই। এরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে কথা বলছে। তবে এদের মুখ শুকনো। ভয়-পাওয়া চোখ।

মেজর সাহেব এগিয়ে এলেন মনার দিকে। মনার ছোট ভাইটি শক্ত হয়ে গেল। মনার সঙ্গে মেজর সাহেবের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো। কথাবার্তা হলো রফিকের মাধ্যমে। আজিজ মাস্টার ও ইমাম সাহেবকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তারা বসে রইল বিলের পাড়ে। প্রশ্নোত্তর শুরু হলো।

‘তুমি একটি খুন করেছ?’

মনা জবাব দিলো না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

‘চুপ করে থাকবে না। স্পষ্ট জবাব দাও। বলো, হ্যাঁ কিংবা না।’

‘হ্যাঁ।’

‘গুড। স্পষ্ট জবাব আমি পছন্দ করি। এখন বলো—কেন করেছ? বিনা কারণে তো কেউ মানুষ মারে না।’

‘হে আমার পরিবারের সঙ্গে খারাপ কাম করেছে।’

‘তাই নাকি?’

‘জে আজ্ঞে।’

‘উত্তেজিত হবার মতোই একটি ব্যাপার। তোমার স্ত্রীকে কি শাস্তি দিয়েছ?’

মনা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। জবাব দিলো না। প্রশ্নের ধারা সে বুঝতে পারছে না।

‘বলো বলো। কুইক। সময় বেশি নেই আমার হাতে।’

মনা ঘামতে শুরু করেছে।

‘আমার মনে হচ্ছে তুমি কোনো শাস্তি দাওনি।’

‘জি-না।’

‘সে নিশ্চয়ই খুব রূপবতী?’

মনা চোখ তুলে তাকাল। কিছুই বলল না।

‘বলো। চট করে বলো। সে কি রূপবতী?’

‘জি।’

‘তাহলে অবশ্য শাস্তি না দিয়ে ভালোই করেছ। একটি সুন্দরী নারীকে শাস্তি দেওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

তোমার স্ত্রীর নাম কী?’

মনার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। মেজর সাহেবের কথাবার্তা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

‘বলো, তোমার স্ত্রীর নাম বলো।’

মনা কিছুই বলল না। রফিক বলল, ‘আমের মানুষরা অপরিচিত মানুষের কাছে স্ত্রীর নাম বলে না।’

‘কেন বলে না?’

‘আমি জানি না, স্যার।’

‘তুমি তো অনেক কিছুই জানো। এটা জানো না?’

‘আমি অনেক কিছু জানি না।’

মেজর সাহেব মনার দিকে আরও কয়েক পা এগুলেন। আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, ‘এই ছেলেটি কী হয় তোমার?’

‘এ আমার ছোট ভাই।’

‘ওর নাম কী?’

‘বিরু।’

মেজর সাহেব তাকালেন বিরুর দিকে। বিরু কঁকড়ে গেল। মেজর সাহেব শান্ত্বরে বললেন, ‘বিরু, তুমি লুঙ্গি ধরে টানাটানি করছ কেন? লুঙ্গি ছেড়ে দাও।’ বিরু লুঙ্গি ছেড়ে দিলো না। আরও ঘেঁষে গেল ভাইয়ের দিকে। তার চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে। শিশুরা অনেক কিছু আগেই বুঝতে পারে। সেও হয়তো পারছে।

‘মনা।’

‘জি।’

‘তুমি বড় একটা অন্যায় করেছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার শাস্তি হবে। তোমার কি কিছু বলার আছে?’

মনা তাকিয়ে রইল। তার চোখে পলক পড়ছে না। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। অস্থির ভঙ্গিতে দৃষ্টিতে বললেন, ‘এই দুজনকে পানিতে দাঁড় করিয়ে দাও।’ রফিক ইংরেজিতে বলল, ‘এই বাচ্চাটিকেও?’

‘হ্যাঁ।’

‘স্যার, এর কি কোনো প্রয়োজন আছে?’

‘প্রয়োজন আছে। এর প্রয়োজন আছে। আমি নিষ্ঠুরতার একটা নমুনা দেখাতে চাই।’

‘স্যার, তার কোনো প্রয়োজন নাই।’

‘প্রয়োজন আছে। আজ এই ঘটনাটি ঘটবার পর মিলিটারির নাম শুনলে ওরা কাপড় নষ্ট করে দেবে। গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে।’

‘তাতে কী লাভ স্যার?’

‘লাভ-লোকসান আমার দেখার কথা, তোমার না। আমার সঙ্গে তর্ক করবে না।’

রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, ‘এসব কথা পরবর্তী সময়ে কেউ মনে রাখবে না। অত্যাচারী রাজারা ইতিহাসে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মানিত হন। আলেকজান্ডারের নৃশংসতার কথা কি কেউ জানে? সবাই জানে, আলেকজান্ডার দি গ্রেট।’

রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব সহজ সুরে বললেন, ‘যা করতে বলা হয়েছে, করো। আর শোনো, ঐ ইমাম এবং ঐ মাস্টার-ওদের দুজনকে খুব কাছাকাছি কোথাও বসিয়ে দাও। আমি চাই যাতে ওরা খুব ভালোভাবে দৃশ্যটা দেখে।’

‘ঠিক আছে, স্যার।’

‘বাই দা ওয়ে, আমি দেখলাম, ঐ ইমাম তোমার হাত ধরে ধরে আসছে? কী ব্যাপার?’

‘হাঁটতে পারছিল না।’

‘ঠিকই পারবে। দৃশ্যটি তাদের দেখতে দাও, তারপর ওদের হাঁটতে বললে হাঁটবে, দৌড়াতে বললে দৌড়াবে। লাফাতে বললে লাফাবে। ঠিক নয় কি?’

‘হয়তো ঠিক।’

‘হয়তো বলছ কেন? তোমার সন্দেহ আছে?’

‘জি না, স্যার।’

‘গুড। সন্দেহ থাকা উচিত নয়। রফিক!’

‘জি স্যার।’

‘তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরুব। গ্রামটি ভালোমতো ঘুরে দেখতে চাই।’

‘ঠিক আছে স্যার।’

‘মনে হয় দেখার মতো ইন্টারেস্টিং অনেক কিছুই আছে এ গ্রামে।’

‘কিছুই নেই স্যার। এটা একটা দরিদ্র গ্রাম।’

রাজাকাররা মনা আর তার ভাইটিকে ঠেলে পানিতে নামিয়ে দিলো। বিরু তার ভাইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। সে কাঁপছে থরথর করে। মনা এক হাতে তার ভাইকে ধরে আছে।

রাইফেল তাক করামাত্র বিরু চিৎকার করতে লাগল, ‘দাদা, বড় ভয় লাগে! ও দাদা, ভয় লাগে!’ মনা মৃদুস্বরে বলল, ‘ভয় নাই। আমাকে শক্ত কইরা ধর।’ বিরু প্রাণপণ শক্তিতে ভাইকে আঁকড়ে ধরল।

ইমাম সাহেব গুলি হবার সময়টাতে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এবং তার পরপরই মুখভর্তি করে বমি করলেন। আজিজ মাস্টার সমস্ত ব্যাপারটি চোখের সামনে ঘটতে দেখল। এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

১১

আলো মরে আসছে।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেজর সাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কী রফিক, বৃষ্টি হবে?’

‘হতে পারে। এটা ঝড়বৃষ্টির সময়।’

‘তোমার দেশের এই ঝড়বৃষ্টিটা ভালোই লাগে।’

রফিক মৃদুস্বরে বলল, ‘তোমার দেশ বললেন কেন?’

মেজর সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। যেন গ্রামে কোনো জনমানুষ নেই। মেজর সাহেব হালকা গলায় বললেন, ‘মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবার একটা আলাদা আনন্দ আছে। আছে না?’

রফিক জবাব দিলো না। মেজর সাহেব বললেন, ‘মানুষের ইনস্টিংক্ট-এর মধ্যে এটা আছে। অন্যকে পায়েল নিচে রাখার আকাঙ্ক্ষা। তোমার নাই?’

‘না।’

‘আছে, তোমারও আছে। সবারই আছে। থাকতেই হবে।’

রফিক কিছু বলল না। তারা হাঁটছে পাশাপাশি। মেজর সাহেব কথা বলছেন বন্ধুর মতো। তার কথার ধরন দেখে মনে হয় রফিককে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।

বদিউজ্জামানের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় মীর আলি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, ‘কেডা যায়? কেডা যায়, জয়নাল মিয়া?’

মেজর সাহেব খমকে দাঁড়ালেন। রফিক বলল, 'লোকটা স্যার অন্ধ।' মেজর সাহেবকে মনে হলো এই খবরে বেশ উৎসাহ বোধ করছেন।

'কে লোকটি, কথ্য বলে না কেডা গো?'

'আমি রফিক।'

'রফিকটা কেডা? কোন বাড়ির?'

'ঘরের ভেতর গিয়ে বসেন চাচা।'

মেজর সাহেব ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তুমি ওকে কী বললে?'

রফিক ইংরেজিতে বলল, 'আমি তাঁকে ঘরে যেতে বললাম।'

'কেন?'

'এমনি বললাম।'

মীর আলি ভয়-পাওয়া গলায় চৈচাল, 'এরা কে? এরা কে?'

মেজর সাহেব বললেন, 'তুমি ওকে বলো আমি মেজর এঞ্জাজ আহমেদ, কমান্ডিং অফিসার, ফিফটি এইটথ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন।'

'স্যার বাদ দেন। বুড়ো মানুষ।'

'তোমাকে বলতে বলেছি, তুমি বলো। যাও, কাছে গিয়ে বলো।'

রফিক এগিয়ে গেল। মেজর সাহেব তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। তিনি কি বুড়োর চোখে-মুখে কোনো পরিবর্তন দেখতে চাচ্ছিলেন? কোনোরকম পরিবর্তন অবশ্য দেখা গেল না। রফিক ফিরে আসতেই মেজর সাহেব বললেন, 'তুমি এই অন্ধ বুড়োকে বলো, মেজর সাহেব আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন।'

রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও।'

রফিক এগিয়ে গেল। বুড়ো মীর আলি কিছুই বলল না। মাথা নিচু করে বসেই রইল।

আকাশে মেঘ জমছে। প্রচুর মেঘ। কালবৈশাখী হবে নিশ্চয়ই। তারা হাঁটছে নিঃশব্দে। রফিক একটি সিগারেট ধরিয়েছে। মেজর সাহেব তাকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছেন।

'রফিক!'

'জি স্যার।'

'তুমি তো জানতে চাইলে না আমি ওকে সালাম জানালাম কেন। জানতে চাও না?'

রফিক কিছু বলল না।

রেশোবা গ্রামে আমার যে বৃদ্ধ বাবা আছেন তিনি অন্ধ। তিনিও বাড়ির উঠোনে এই বুড়োটির মতো বসে থাকেন। পায়ের শব্দ পেলেই এই বুড়োটির মতো বলেন, 'ইয়ে কৌন?'

'পৃথিবীর সব জায়গার মানুষই আসলে এক রকম।'

'কথাটি কি তুমি বিশেষ কোনো কারণে বললে?'

'না, কোনো বিশেষ কারণে বলিনি।'

'রফিক, আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। সারভাইভালের প্রশ্ন। এই সময়ে অন্যায় কিছু হবেই। উল্টোটা যদি হতো-ধরো বাঙালি সৈন্য আমার গ্রামে ঠিক আমাদের মতো অবস্থায় আছে, তখন তারা কী করত? বলো, কী করত তারা? যে অন্যায় আমরা করছি তারা কি সেগুলো করত না?'

‘না।’

‘না? কী বলছ তুমি! যুক্তি দিয়ে কথা বলো। রাগ, ঘৃণা, হিংসা আমাদের মধ্যে আছে, তোমাদের মধ্যেও আছে।’
রফিক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত ইশারা করে বলল, ‘এরা ডেডবডিটা এখনো সরায়নি। মেজর সাহেব দেখলেন, দরজার পাশে বুড়োমতো একটি লোক কাত হয়ে পড়ে আছে। নীল রঙের বড় বড় মাছি ভনভন করে উড়ছে চারদিকে।’

‘স্যার, এই লোকটির নাম নীলু সেন।’

‘এর কি কোনো আত্মীয়স্বজন নেই? এভাবে ফেলে রেখেছে কেন?’

‘রফিক গলা উচিয়ে ডাকল, বলাই, বলাই! কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।’

‘কাকে ডাকছিলে?’

‘বলাইকে। ওর ছেলে কিংবা এরকম কিছু। এরা দুজন এই বাড়িতে থাকে।’

‘এত বড় একটা বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী থাকে?’

‘এখন থাকে একটি।’

‘রফিক!’

‘জি স্যার!’

‘আমার মনে হয়, তুমি সূক্ষ্মভাবে আমাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছ।’

‘স্যার, আমি কিছুই বলবার চেষ্টা করছি না। এখন যা বলার তা আপনি বলবেন। আমি শুধু শুনব।’

‘এর মানে কী?’

‘কোনো মানে নাই, স্যার। আপনি এত মানে খুঁজছেন কেন?’

দুজন আবার হাঁটতে শুরু করল। কালীমন্দিরের সামনে মেজর সাহেব থামলেন। কালীমূর্তি তিনি এর আগে দেখেননি। একটি মাত্র দরজা খোলা, পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। মেজর সাহেব ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখতে চাইলেন। রফিক বলল, ‘স্যার, বড় হবার সম্ভাবনা। আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত।’

‘ফিরব। তোমাদের কালীমূর্তি দেখে যাই।’

‘তোমাদের বলা ঠিক নয় স্যার। আমি মুসলমান।’

‘তোমরা মাত্র পঁচিশ ভাগ মুসলমান, বাকি পঁচাত্তর ভাগ হিন্দু। তুমি মন্দিরে ঢুকে মূর্তিকে প্রণাম করলেও আমি কিছুমাত্র অবাক হব না।’

রফিক কোনো জবাব দিলো না। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে আত্মহ নিয়ে মূর্তি দেখলেন। হাসিমুখে বললেন, ‘চারটি হাতে এই মহিলাটিকে মাকড়সার মতো লাগছে। লাগছে না?’

‘আমার কাছে লাগছে না। আমরা ছোটবেলা থেকেই মূর্তিগুলো এরকম দেখে আসছি। আমার কাছে এটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়।’

মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘রফিক!’

‘জি স্যার!’

‘এই মূর্তিটির পেছনে একজন কেউ লুকিয়ে আছে।’

রফিক চুপ করে রইল।

‘তুমি সেটা আমার আগেই বুঝতে পেরেছ। পারোনি?’

রফিক জবাব দিলো না।

‘বুঝতে পেরেও আমাকে কিছু বলোনি।’

রফিক ক্লান্তস্বরে ডাকল, ‘বলাই!’

মূর্তির পেছনে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠল।

‘তুমি কী করে বুঝলে ও বলাই?’

‘আমি অনুমান করছি। মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে, তাই অনুমান করছি। বলাই নাও হতে পারে। হয়তো অন্যকেউ। হয়তো কানাই।’

‘মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে সে কি ভাবছে মা কালী ওকে রক্ষা করবে?’

‘ভাবাই তো স্বাভাবিক। অনেক মুসলমান এরকম অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়। ভাবে, আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন।’

মেজর সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। রফিক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ‘অনেক জায়গায় মসজিদ থেকে টেনে বের করে ওদের মারা হয়েছে। আল্লাহ তাদের রক্ষা করতে পারেননি।’

‘তুমি কী বলতে চাচ্ছে?’

‘আপনি যদি বলাইকে মারতে চান কালীমূর্তি ওকে রক্ষা করতে পারবে না। এটাই বলতে চাচ্ছি, এর বেশি কিছু না।’

‘ওকে বের হয়ে আসতে বলো।’ রফিক ডাকল, ‘বলাই, বলাই!’ বলাই জবাব দিলো না।

একটা মৃদু ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বড় শুরু হলো। প্রচণ্ড ঝড়। মেজর সাহেব মন্দিরের ভেতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হুম হুম শব্দ উঠছে। দেখতে দেখতে আবহাওয়া রক্তমূর্তি ধারণ করল। মন্দির-সংলগ্ন বাঁশঝাড় ভয়-ধরানো শব্দ হতে লাগল। রফিক এসে দাঁড়াল মেজর সাহেবের পাশে। মেজর সাহেব মুগ্ধকণ্ঠে বললেন, ‘বিউটিফুল!’ কালীমূর্তির পেছনে উবু হয়ে বসে থাকা বলাইয়ের কথা তাঁর মনে রইল না। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মেজর সাহেব দ্বিতীয়বার বললেন, ‘বিউটিফুল!’

সামনে খোলা মাঠ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মাঠে ধূলি ও শুকনো পাতায় ঘূর্ণির মতো উঠেছে। এর মধ্যেই খালি গায়ে একজনকে ছুটে যেতে দেখা গেল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে মহা উল্লসিত। মেজর সাহেব বললেন, ‘লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ?’ রফিক নিম্পূহ স্বরে বলল, ‘ও নিজাম, পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটি করে পাগল থাকে।’

‘এ গ্রামে সবাইকে কি তুমি এর মধ্যেই চিনে ফেলেছ?’

‘না, কয়েকজনকে চিনি। সবাইকে না।’

‘ঐ পাগলটা কি জঙ্গল মাঠের দিকে যাচ্ছে না?’

‘মনে হয় যাচ্ছে। পাগলরা বনজঙ্গল খুব পছন্দ করে। মানুষের চেয়ে গাছকে তারা বড় বন্ধু মনে করে।’

‘রফিক!’

‘জি স্যার।’

‘তোমার পড়াশোনা কতদূর?’

‘পাসকোর্সে বিএ পাশ করেছি।’

‘মাঝে মাঝে তুমি ফিলসফারদের মতো কথা বলো।’

‘পরিবেশের জন্য এরকম মনে হয়। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে সাধারণ কথাও খুব অসাধারণ মনে হয়।’
‘তা ঠিক।’

মেজর সাহেব মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঝড়ের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। মন্দিরের একটা জানালা খুলে গিয়েছে। খটখট শব্দে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। রফিক বলল, ‘স্যার কি ভেতরে গিয়ে বসবেন?’
‘না।’

পাগলা নিজাম সত্যি সত্যি কি বনের ভেতর ঢুকেছে? মেজর সাহেব তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তাকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হচ্ছে। কপালে ভাঁজ পড়েছে।

‘রফিক!’

‘জি স্যার।’

‘জর্জ বার্নার্ড শ মিলিটারি অফিসার সম্পর্কে কী বলেছেন জানো?’

‘জানি না স্যার।’

‘তিনি বলেছেন, দশজন মিলিটারি অফিসারের মধ্যে নজনই হয় বোকা। বাকি একজন রামবোকা।’

‘জর্জ বার্নার্ড শ’র রচনা আমাদের সিলেবাসে ছিল না। আমি তাঁর কোনো লেখা পড়ি নি।’

‘লোকটি রসিক। তবে তার কথা ঠিক নয়। মাঝে মাঝে মিলিটারি অফিসারদের মধ্যেও বুদ্ধিমান লোক থাকে। যেমন আমি। ঠিক না?’

‘জি স্যার।’

‘আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি যাকে পাগল বলছ সে পাগল নয়। সে জঙ্গল মাঠে যাচ্ছে খবর দিতে।’

‘নিজাম আলি পাগল। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।’

‘কী কথা হয়েছে?’

‘পাগলদের সঙ্গে যেরকম কথা হয় সেরকম। বিশেষ কিছু না।’

‘বুঝলে কী করে ও পাগল?’

‘ও মিলিটারি আসায় অত্যন্ত খুশি হয়েছে। এর থেকেই বুঝছি।’

‘তুমি বলতে চাও মিলিটারি আসাটা কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়?’

‘জি না, স্যার।’

মেজর সাহেব ক্র কুণ্ঠিত করে দূরের বনের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, ‘চলো যাই।’

‘কোথায়?’

‘স্কুলে ফিরে যাই।’

‘এই ঝড়ের মধ্যে?’

‘হ্যাঁ।’

মেজর সাহেব মন্দিরের চাতাল থেকে নেমে পড়লেন। ঝড়ে উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। কিন্তু তিনি হাঁটছেন স্বাভাবিকভাবেই। সাপের শিসের মতো শিস দিচ্ছে বাতাস। জুম্মাঘরের কাছাকাছি আসতেই মুখলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। মেজর এজাজ আহমেদ সেই বৃষ্টি গ্রাহ্যই করলেন না।

নিজের মনে গুনগুন করতে লাগলেন। কিংস্টোন ট্রয়ের একটি গান, যার সঙ্গে বর্তমান পরিবেশ সমস্যার কোনো সম্পর্কই নেই।

Pretty girls are everywhere
And when you call me I will be there.

মেজর সাহেবের গলা বেশ সুন্দর।

১২

ঝড় স্থায়ী হলো আধঘণ্টার মতো।

ঝড়ে গ্রামের কারও তেমন কোনো ক্ষতি হলো না। শুধু বদিউজ্জামানের নতুন টিনের বাড়িটির ছাদ উড়ে গেল। মীর আলি আতঙ্কে অস্থির হয়ে চোঁচাতে লাগল। অনুফা কী করবে ভেবে গেল না। তাদের বাড়ি গ্রামের বাইরে। ছুটে গ্রামে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। গোয়ালঘরটি এখনো টিকে আছে। সেখানে যাওয়া যায়। কিন্তু বাতাসের বেগ এখনো কমেনি। সেই নড়বড়ে চালা কখন মাথার উপর পড়ে তার ঠিক কী? সে পরীবানুকে কোলে নিয়ে তার শ্বশুরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মীর আলি ভাঙা গলায় চোঁচাতে লাগল, 'বদি! বদিরে, ও বদিউজ্জামান!'

বদিউজ্জামানের চোখ জবাফুলের মতো লাল। এখন আর তার আগের মতো কষ্টবোধ হচ্ছে না। পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভালোই লাগছে। ঝড়বৃষ্টির সময় সে নিজের মনে খানিকক্ষণ হেসেছে। কেন হেসেছে সে জানে না। কোনো কারণ ছাড়াই হাসি এসেছে। বদিউজ্জামানের ভয়ও কমে এসেছে। কিছুক্ষণ আগে একটি শেয়াল এসে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বেশ শব্দ করেই বলেছে—'বাহ্ বাহ্।' এই শিয়ালটি আবার এসেছে। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। টকটকে লাল চোখ নিয়ে বদিউজ্জামান তাকিয়ে আছে শেয়ালটির দিকে। তার ভালোই লাগছে। গিরগিটি দুপুরের পর থেকেই নেই। বদিউজ্জামানের খুব নিঃসঙ্গ লাগছিল। এখন আর লাগছে না।

মাগরেবের নামাজ আদায় করতে চার-পাঁচজন মুসল্লি গিয়েছিল মসজিদে। আজানের পরপরই কয়েকটি গুলির শব্দ হওয়ায় তারা নামাজ আদায় না করেই ফিরে এল। ফেরার পথে তাদের মনে হলো, কাজটা ঠিক হলো না। এতে আল্লাহর গজব পড়ার সম্ভাবনা। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। নামাজ পড়ল। মসজিদ থেকে বেরবার সময় দেখল, রাস্তায় মিলিটারি। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। রাত কাটল সেখানেই।

সন্ধ্যার পর গ্রামের কোথাও কোনো বাতি জ্বলল না। চারদিকে অন্ধকার। সবাই বসে রইল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু কৈবর্তপাড়ায় কে যেন সুর করে কাঁদছে। সেই সুরেলা কান্না ভেসে আসছে অনেকদূর পর্যন্ত। চিত্রা বুড়ি বসে আছে কৈবর্তপাড়ায়। তাকে কেউ কিছু বলেছে না। চিত্রা বুড়িও কাঁদছে। হাউমাউ কান্না।

বলাই কোনোখানেই বেশিক্ষণ থাকতে পারছে না। সারাক্ষণই তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তাকে ধরতে আসছে। সে অল্পকিছু সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েকবার জায়গা বদল করল। বেশি দূর কখনো গেল না। সেনবাড়ি। সেনবাড়ির মন্দির। এর মধ্যেই তার ঘোরাফেরা। সন্ধ্যা মেলাবার পর সে চিলেকোঠার লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদে আধহাতের মতো পানি জমে আছে। সে বসে রইল পানির মধ্যে। কিছুক্ষণ তার ভালোই কাটল। তারপরই মনে হতে লাগল লোহার সিঁড়িতে যেন শব্দ হচ্ছে। মিলিটারির উঠে আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। তারপর আবার সব চুপচাপ। কেউ আসেনি—মনের ভুল।

বলাইয়ের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল। আবার মনে হলো, কেউ আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। বলাই দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

ঝড়ের সময় একজন মিলিটারি সুবাদার ও তিনজন রাজাকারের একটি দল ছুটতে ছুটতে সফদরউল্লাহর চালাঘরে এসে উঠেছিল। সফদরউল্লাহ বাড়িতে ছিল না। মেয়েছেলেদের গ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে নেবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না এ নিয়ে সে আলাপ করতে গিয়েছিল জয়নাল মিয়ার সঙ্গে।

ওরা সফদরউল্লাহর ঘরে ঢুকেই টর্চ টিপল। সেই টর্চের আলো পড়ল জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা সফদরউল্লাহর স্ত্রী ও তার ছোট বোনের মুখে। ছোট বোনটির বয়স বারো। মিলিটারি সুবাদার মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, এরকম সুন্দর মেয়ে সে কাশ্মিরেই শুধু দেখেছে, বাঙালিদের মধ্যে এরকম সুন্দর দেখিনি। সে খুবই সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। ঝড়ের জন্য এই দুবোনের চিৎকার কেউ শুনতে পেল না।

মেয়েদের গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে জয়নাল মিয়ার অভিমত হলো—এর কোনো দরকার নাই। হিন্দু মেয়ের কিছুটা ভয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমান মেয়েদের কোনো ভয় নাই। জয়নাল মিয়া দৃঢ়স্বরে বললেন, ‘মুসলমানদের শইলে এরা হাত দেয় না। এই গ্রামে যে তিনটা মানুষ মারা গেছে, এর মধ্যে মুসলমান কেউ আছে? কও তোমরা, আছে?’

কথা খুবই সত্যি। জয়নাল মিয়া নিচুস্বরে বলল, ‘মুসলমানের সঙ্গে ব্যবহারও খুব ভাল। মীর আলি চাচারে মেজর সাব সালাম দিছে। বিশ্বাস না হইলে জিগাইয়া আও।’

এই কথাটিও সত্যি। তবু মতি বলল, ‘ঘরের মেয়েছেলেরা বড় অস্থির হইয়া পড়ছে।’ জয়নাল মিয়া দৃঢ়স্বরে বলল, রাইত দুপুরে এভাবে টানাটানি করার কোনো দরকার নাই। যাও, তোমরা বাড়িত গিয়া আল্লাহ খোদার নাম নেও। ফি আমানিল্লাহ্। ভয়ের কিছু নাই।

যে অল্প কজন এসেছিল তারা ঝড়ের মধ্যেই চলে গেল। ঝড় থামবার পর জয়নাল মিয়ার কাছে খবর এলো—মেজর সাহেব তার সঙ্গে দেখা করতে চান। সে যেন দেরি না করে। জয়নাল মিয়া ভীতস্বরে বলল, ‘যাও, গিয়া বলো, আমি আসতছি।’ বাঙালি রাজাকারটি বিরক্ত মুখে বলল, ‘আমার সাথে চলেন। সাথে যাইতে বলছে।’

সফদরউল্লাহর বাড়ির সামনে এসে জয়নাল মিয়ার মনে হলো ভেতর বাড়িতে মেয়েছেলে কাঁদছে। সফদরউল্লাহ উঠানে বসে আছে। জয়নাল মিয়া জিজ্ঞেস করল, ‘কী হইছে?’ সফদরউল্লাহ জবাব দিলো না?

‘কান্দে কে?’

সফদরউল্লাহ সেই প্রশ্নেরও জবাব দিলো না। সঙ্গের রাজাকারটি জয়নাল মিয়ার পিঠে ঠেলা দিয়ে বলল, ‘তাড়াতাড়ি হাঁটেন।’

১৩

মেজর সাহেব এক মগ কফি হাতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সমস্ত গা ভেজা। মাথায় টুপি নেই। ভেজা চুল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। ইমাম সাহেব বসেই রইলেন। তাঁর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কিছু সময় পরপরই তাঁর বমি হচ্ছে। ঘরময় বমির কটু গন্ধ। রফিক একটি হারিকেন টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার এগিয়ে দিলো মেজর সাহেবের দিকে।

তিনি বসলেন না। একটি পা রাখলেন চেয়ারে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রশ্নগুলো ইমাম সাহেবের প্রতি। রফিককে প্রতিটি প্রশ্ন ও উত্তর ইংরেজি করে দিতে হচ্ছিল। প্রশ্নোত্তর পর্বের গতি হলো শূন্য, সেজন্য মেজর সাহেবের কোনো ধৈর্যচ্যুতি হলো না।

‘তারপর, ইমাম ভালো আছ?’

‘জি।’

‘আমি তো খবর পেলাম ভালো নেই। ক্রমাগত বমি হচ্ছে।’

‘জি ছজুর।’

‘শান্তির দৃশ্যটা ভালো লাগে নি?’

ইমাম সাহেব জবাব দিলেন না। বমির বেগ সামলানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। মেজর সাহেবের মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল।

‘দৃশ্যটি কি খুব কঠিন ছিল?’

‘জি।’

‘তুমি নিজে নিশ্চয়ই গরু-ছাগল জবাই কর। কর না?’

‘জি করি।’

‘তখন খারাপ লাগে না?’

ইমাম সাহেব একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেললেন। মেজর সাহেব কফির মগে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। জবাব পাওয়া গেল না।

‘ইমাম!’

‘জি স্যার!’

‘এখন আমাকে বলো, তোমাদের ঐ জঙ্গলে মোট কতজন বাঙালি সৈন্য আছে?’

‘আমি জানি না স্যার।’

‘সঠিক সংখ্যাটি না বলতে পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। অনুমান করে বলো।’

‘আমি জানি না স্যার।’

‘সৈন্য আছে কি না সেটা বলো।’

‘স্যার, আমি জানি না।’

‘আচ্ছা বেশ, সৈন্য নেই, এই কথাটিই তোমার মুখ থেকে শুনি।’

‘স্যার, আমি জানি না। কিছুই জানি না স্যার।’

মেজর সাহেব কফির মগ নামিয়ে রাখলেন। সিগারেট ধরালেন। তার কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল।

‘তুমি কখনো ঐ বনে যাওনি?’

‘জি না স্যার। আমি ধর্মকর্ম নিয়ে থাকি।’

‘ধর্মকর্ম নিয়ে থাক?’

‘জি স্যার।’

‘মসজিদে লোক হয়?’

‘হয় স্যার।’

‘সেখানে তুমি কি পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করো?’

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। মেজর সাহেবের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ল।

‘খুতবার শেষে পাকিস্তানের জন্যে কখনো দোয়া করেনি?’

‘পৃথিবীর সব মুসলমানের জন্যে দোয়া-খায়ের করা হয় স্যার।’

‘তুমি আমার কথার জবাব দাও। পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করেনি?’

‘জি না স্যার।’

‘বাংলাদেশের জন্যে কখনো দোয়া করেছ?’

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। মেজর সাহেব হঠাৎ প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গেলেন। রফিক তাঁকে উঠে বসাল। মেজর সাহেব ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, ‘ব্যথা লেগেছে?’

‘জি না।’

‘এতটুকু ব্যথা লাগেনি?’

‘জি না স্যার।’

‘আমার হাত এতটা কমজোরি তা জানা ছিল না।’

মেজর সাহেব হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় চড়টি দিলেন। ইমাম সাহেব গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেন। তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল। রফিক তাঁকে তুলতে গেল। মেজর সাহেব বললেন, ‘ও নিজে নিজেই উঠবে। ইমাম উঠে বসো।’ ইমাম সাহেব উঠে বসলেন।

‘এখন বলো, তুমি শেখ মুজিবর রহমানের নাম শুনেছ?’

‘জি শুনেছি।’

‘সে কে?’

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন।

‘সে কে তুমি জানো না?’

মেজর সাহেব এগিয়ে এসে তৃতীয় চড়টি বসালেন। ইমাম সাহেব শব্দ করে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। মেজর সাহেব তাকালেন আজিজ মাস্টারের দিকে।

‘তারপর কবি, তুমি কেমন আছ? ভালো আছ?’

‘জি।’

‘তুমি শুনলাম বেশ শক্তই ছিলে। বমি-টমি কিছু করেনি?’

আজিজ মাস্টার জবাব দিলো না।

‘বাংলাদেশের উপর কখনো কবিতা লিখেছ?’

‘জি না স্যার।’

‘কেন, লেখো নি কেন?’

আজিজ মাস্টার চুপ করে রইল।

‘শেখ মুজিবের উপর লিখেছ?’

‘জি না।’

আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন, ‘তুমি প্রেমের কবিতা ছাড়া অন্যকিছু লেখো না?’

‘জি না।’

‘তুমি দেখি দারুণ প্রেমিক মানুষ। সব কবিতা কি মালা নামের ঐ বালিকাকে নিয়ে লেখা? জবাব দাও। বলো হ্যাঁ কিংবা না।’

‘হ্যাঁ।’

‘শোনো আজিজ, আমি কথা রাখি। আমি কথা দিয়েছিলাম ঐ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব। সেটা আমার মনে আছে। আমি ঐ মেয়ের বাবাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। এখন তুমি আমাকে বলো—ঐ বনে কতজন সৈন্য লুকিয়ে আছে?’

‘স্যার, বিশ্বাস করেন, আমি কিছুই জানি না।’

‘আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না। তুমি বোধহয় জানো না আমি কী পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারি। তুমি জানো?’

‘জি স্যার, জানি।’

‘না, তুমি জানো না। তবে এক্ষুনি দেখতে পাবে। রফিক, তুমি ওর জামাকাপড় খুলে ওকে নেংটো করে ফেলো।’

আজিজ মাস্টার হতভম্ব হয়ে তাকাল। এই লোকটা বলে কী? আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন, ‘দেখি করবে না, আমার হাতে সময় বেশি নেই। রফিক!’

‘জি স্যার।’

‘এই মিথ্যাবাদী কুকুরটাকে নেংটা করে সমস্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখাবে। বুঝতে পারছ?’

‘পারছি।’

‘আর শোনো, একটা ইটের টুকরো ওর পুরুষাঙ্গে বুলিয়ে দেবে। এতে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা হিউমার আসবে।’

‘আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল, আমি কিছুই জানি না, স্যার। একটা কোরান শরিফ দেন, কোরান শরিফ ছুঁয়ে বলব।’

‘তার কোনো প্রয়োজন দেখি না। রফিক! যা করতে বলছি, করো।’

রফিক থেমে থেমে বলল, ‘মানুষকে এভাবে লজ্জা দেবার কোনো অর্থ হয় না।’ মেজর সাহেবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হতে লাগল। তিনি তাকিয়ে আছেন রফিকের দিকে। রফিক বলল, ‘আপনি যদি একে অপরাধী মনে করেন তাহলে মেরে ফেলেন। লজ্জা দেবার দরকার কী?’

‘তুমি একে অপরাধী মনে করো না?’

‘না। আমার মনে হয় সে কিছু জানে না।’

‘সে এই গ্রামে থাকে, আর এতবড় একটা ব্যাপার জানবে না?’

‘জানলে বলত। কিছু জানে না, তাই বলছে না।’

‘বলবে সে ঠিকই। ইট বেঁধে তাকে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাও—দেখবে তার মুখে কথা ফুটেছে। তখন সে প্রচুর কথা বলবে।’

রফিক ঠান্ডা স্বরে বলল, ‘স্যার, ওকে এরকম লজ্জা দেওয়াটা ঠিক না।’

‘কেন ঠিক না?’

‘আপনি শুধু ওকে লজ্জা দিচ্ছেন না, আপনি আমাকেও লজ্জা দিচ্ছেন। আমিও ওর মতো বাঙালি।’

‘তাই নাকি। আমি তো জানতাম তুমি পাকিস্তানি। তুমি কি সত্যি পাকিস্তানি?’

‘জি স্যার।’

‘আমার মনে হয় এটা তোমার সবসময় মনে থাকে না। মনে রাখবে।’

‘জি স্যার, রাখব।’

‘এটা তোমার নিজের স্বার্থেই মনে রাখা উচিত।’

রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব বললেন, ‘একটা মজার ব্যাপার কি জানো রফিক? তুমি যদি আজিজ মাস্টারকে চয়েস দাও মৃত্যু অথবা লজ্জাজনক শাস্তি, তাহলে সে লজ্জাজনক শাস্তিটাই বেছে নেবে। মহানন্দে পুরুষাঙ্গে ইট বেঁধে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াবে। জিজ্ঞেস করে দেখো।’ রফিক কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মেজর সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, ‘আজিজ, পরিষ্কার উত্তর দাও। মরতে চাও, না চাও না? আমি দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করব না। ত্রিশ সেকেন্ডের ভেতরে জবাব চাই। বলো মরতে চাও, না চাও না?’

‘মরতে চাই না।’

মেজর সাহেব হাসিমুখে বললেন, ‘বেশ, তাহলে কাপড় খুলে ফেলো। তোমাকে ঠিক এক মিনিট সময় দেওয়া হলো তার জন্য।’ আজিজ মাস্টার কাপড় খুলতে শুরু করল।

‘রফিক, আমার কথা বিশ্বাস হলো?’

‘হলো।’

‘বাঙালিদের মান-অপমান বলে কিছু নেই। একটা কুকুরেরও আত্মসম্মান থাকে, এদের তাও নেই। আমি যদি ওকে বলি, যাও, ঐ ইমামের পশ্চাদ্দেশ চেটে আসো ও তাই করবে।’

রফিক মৃদুস্বরে বলল, ‘মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেকেই এরকম করবে।’

‘তুমি করবে?’

‘জানি না। করতেও পারি। মৃত্যু একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কে কী করবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়।’

‘তাই বুঝি?’

‘জি স্যার। আপনার মতো একজন সাহসী মানুষও দেখা যাবে কাপুরুষের মতো কাণ্ডকারখানা করছে।’

মেজর সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এবং তারও মিনিটখানেক পর জয়নাল মিয়াকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। আজিজ মাস্টার দুহাতে তার লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করল। ইমাম সাহেব বেশ স্বাভাবিক গলায় বললেন, ‘জয়নাল মিয়া, ভালো আছেন?’

জয়নাল কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল-বলতে পারল না। আজিজ মাস্টারের মতো একজন বয়স্ক মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে-এটি এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইমাম সাহেব বললেন, ‘বড় খারাপ সময় জয়নাল সাব, আল্লাহ খোদার নাম নেন।’

জয়নাল মিয়া আবারও কিছু বলতে চেষ্টা করল। বলতে পারল না। কথা আটকে গেল।

রফিক শান্তস্বরে বলল, ‘জয়নাল সাহেব, আপনি বসেন। স্যার যা যা জিজ্ঞেস করবেন তার সত্যি জবাব দিবেন। বুঝতেই পারছেন।’ জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। ইমাম সাহেব বললেন, ‘চেয়ারে বসেন, মাটিতে প্রস্রাব আছে নাপাক জায়গা।’

মেঘ নেই।

আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

রাত প্রায় আটটা, কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। হাওয়া থেমে গেছে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। সফদরউল্লাহ একটা দা হাতে মাঠে নেমে পড়ল। সে দুজনকে খুঁজছে। একজন তালগাছের মতো লম্বা। গোঁফ আছে। অন্যজন বাঙালি, তার মুখে বসন্তের দাগ। সফদরউল্লাহ কোনো রকম শব্দ না করে হাঁটছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। সে যেভাবে হাঁটছে তাতে মনে হয় অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে। কোনো কোনো সময় মানুষের ইন্দ্রিয় অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

সে প্রথমে গেল বিলের দিকে। কেউ নেই সেখানে। বেশকিছু কাটা ডাব পড়ে আছে চারদিকে। সফদরউল্লাহ দীর্ঘ সময় বিলের পাড়ে দা হাতে বসে রইল। বাতাস নেই কোথাও, তবু বিলের পানিতে ছাৎ ছাৎ শব্দ হচ্ছে। ওরা আবার হয়তো আসবে। পানিতে দাঁড় করিয়ে আরও মানুষ মারবে। সফদরউল্লাহর মনে হলো কেউ একজন যেন এদিকে আসছে। সে শব্দ করে দাটি ধরে চৌঁচিয়ে বলল, 'কেডা?'

'আমি নিজাম। আপনে কী করেন?'

'কিছু করি না।'

'অন্ধকারে বইয়া আছেন ক্যান?'

সফদরউল্লাহ ফুঁপিয়ে উঠল। নিজাম বলল, 'সব মিলিটারি জমা হইতেছে জঙ্গলা মাঠে, দেখবেন?' সফদরউল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

'হাতে দাও ক্যান?'

'আছে, কাম আছে। দাওয়ার কাম আছে।'

কৈবর্তপাড়া খালি হয়ে যাচ্ছে।

এরা সরে পড়ছে নিঃশব্দে। এদের অভ্যাস আছে—অতি দ্রুত সবকিছু গুছিয়ে সরে পড়তে পারে। অন্ধকারে এরা কাজ করে। ওদের শিশুরা চোখ বড় বড় করে দেখে, হইচই করে না, কিছুই করে না। মেয়েরা জিনিসপত্র নৌকায় তুলতে থাকে। কোনো জিনিসই বাদ পড়ে না। হাঁস, মুরগি, ছাগল—সবই উঠানো হয়। এরা কাজ করে নিঃশব্দে। প্রবীণরা হুকো হাতে বেশ অনেকটা দূরে বসে থাকে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় কী হচ্ছে না হচ্ছে এরা কিছুই জানে না। এরা ঝিমুতে থাকে। ঝিমুতে ঝিমুতেই চারদিকে লক্ষ রাখে। বুড়ো বয়সেও এদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

মীর আলি খুনখুন করে কাঁদে।

ভাতের জন্য কাঁদে। বদিউজ্জামান বাড়ি ফেরেনি। সে না ফেরা পর্যন্ত অনুফা ভাত চড়াবে না। ঘরে চাল-ডাল সবই আছে। চারটা চাল ফুটাতে এমন কী বামেলা মীর আলি বুঝতে পারে না। অনেক রকম বামেলা আছে ঠিকই—মাথার উপর টিনের ছাদ নেই। গ্রামে মিলিটারি মানুষ মারছে। তাই বলে মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো চলে যায়নি? পরীবানুও বিরক্ত করছে না। ঘুমাচ্ছে। অসুবিধা তো কিছু নেই।

মীর আলি মৃদুস্বরে বলল, 'বৌ, চাইরডা ভাত রাইস্কা ফেল।' অনুফা তীব্র স্বরে বলল, 'আপনে মানুষ, না আর কিছু?'

মীর আলি অবাক হয়ে বলে, 'আমি কী করলাম?'

পনেরো-বিশজন সেপাই বসে আছে ফুলের বারান্দায়। এরাও ক্ষুধার্ত। সমস্ত দিন কোনো খাওয়া হয়নি। ওদের জন্য রান্না হবার কথা মধুবনে। ঝড়ের জন্য নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা হয়েছে। রান্না করা খাবার এসে পৌঁছায়নি। কখন এসে পৌঁছাবে কে জানে! এরা সবাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে শ্রান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। কয়েকজন স্পষ্টতই ঘুমাচ্ছে। কিছু বাঙালি রাজাকার ওদের সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করছে। গল্প জমছে না। ওরা হাল ছাড়ছে না, 'গুস্তাদজি' 'গুস্তাদজি' বলেই যাচ্ছে।

বদিউজ্জামানের মনে হলো জ্বর এসেছে। সে নিশ্চিত হতে পারছে না। মাথায় হাত দিলে কোনো উত্তাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। কিছুক্ষণ আগেও তার শীত ক ছিল। এখন আর করছে না। খুকখুক করে কে যেন কাশল। নাকি সে নিজেই কাশছে? নিজামের মতো তারও মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একবার মনে হলো, শীতল ও লম্বা একটা কী যেন তার শার্টের ভেতর ঢুকে গেছে। সে প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু চিৎকার করল না। মনের ভুল। শার্টের ভেতর কিছুই নেই। বদিউজ্জামানের মনে হলো, সে যেন অনেকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। কথাবার্তা বলতে বলতে কারা যেন এগিয়ে আসছে। এটাও কি মনের ভুল? বদিউজ্জামান উৎকর্ষ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সে ঠিক করে রাখল, মিলিটারিরা তাকে মেরে ফেললে সে বলবে-ভাইয়েরা, কেমন আছেন? বড় মজার ব্যাপার হবে। বদিউজ্জামান নিজের মনে খুকখুক করে হাসতে লাগল। বাঁ দিকে চারটি সবুজ চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে-শেয়াল। দিনে যে শেয়ালটা তাকে দেখে গিয়েছিল সে নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ভাবতে বেশ মজা লাগল বদিউজ্জামানের। সে আবার হাসতে শুরু করল। এবার আর নিজের মনে হাসা নয়, শব্দ করে হাসা।

১৫

রফিক বাইরে এসে দেখল, মেজর সাহেব ফুলঘরের শেষ প্রান্তের বারান্দায় একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। রফিককে দেখে তিনি কিছুই বললেন না। রফিক বারান্দায় নেমে গেল। অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ, তারপর হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। মেজর সাহেব ভারী গলায় ডাকলেন, 'রফিক!'

'রফিক ফিরে এল।'

'কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'তোমার কোথাও না।'

'তোমাকে একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি।'

'বলুন।'

'তুমি কি জানো আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না?'

'জানি।'

'কখন থেকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি জানো?'

'শুরু থেকেই। কোনো বাঙালিকেই আপনি বিশ্বাস করেন না।'

'তা ঠিক। যারা বিশ্বাস করেছে সবাই মারা পড়েছে। আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল। ওরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

'মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল কী করেনি সেটা আপনি জানেন না। অনুমান করছেন।'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক। আমি জানি না।'

মেজর সাহেব হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ঐ মাস্টারটির বিশেষ অঙ্গে ইট বুলিয়ে

‘দিয়েছ?’

‘না।’

‘কেন? প্রমাণ সাইজের ইট পাওনি?’

রফিক কথা বলল না। মেজর সাহেব চাপাস্বরে বললেন, ‘বাঙালি ভাইদের প্রতি দরদ উথলে উঠেছে?’

‘আমার মধ্যে দরদ-টরদ কিছু নাই মেজর সাহেব। ইট ঝুলানোটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।’

‘মোটাই অপ্রয়োজনীয় নয়। আমি ইট-বাঁধা অবস্থায় ওকে গুর প্রেমিকার কাছে নিয়ে যাব। এবং ওকে বলব সেই প্রেমের কবিতাটি আবৃত্তি করতে।’

‘কেন?’

‘রফিক!’

‘জি স্যার।’

‘তুমি আমাকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস কোথায় পেল?’

‘আপনি একজন সাহসী মানুষ। সাহসী মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে আমিও সাহসী হয়ে উঠেছি।’

‘আই সি।’

‘এবং স্যার, আপনি একবার আমাকে বলেছিলেন, আমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা বলে ফেলতে।’

‘বলেছিলাম?’

‘জি স্যার।’

‘সেই প্রিভিলেজ এখন আর তোমাকে দিতে চাই না। এখন থেকে তুমি কোনো প্রশ্ন করবে না।’

‘ঠিক আছে, স্যার।’

‘রফিক!’

‘জি স্যার।’

‘আজ তোমাকে অস্বাভাবিক রকম উৎফুল্ল লাগছে।’

‘আপনি ভুল করছেন, স্যার। আমাকে উৎফুল্ল দেখানোর কোনো কারণ নেই। এমন কিছুই ঘটেনি যে আমি উৎফুল্ল হব।’

‘তুমি বলতে চাও যে বিমর্ষ হবার মতো অনেক কিছু ঘটেছে?’

‘আমি তাও বলতে চাই না।’

মেজর সাহেব পশতু ভাষায় কী যেন বললেন। কোনো কবিতা-টবিতা হবে হয়তো। রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন, ‘রফিক, তুমি পশতু জানো?’

‘জি না, স্যার।’

‘না চাইলেও শোনো। এর মানে হচ্ছে, বেশি রকম বুদ্ধিমানের মাঝে মাঝে বড় রকম বোকামি করতে হয়।’

রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব বললেন, ‘চলো, জয়নাল লোকটির কাছ থেকে কিছু জানতে চেষ্টা করি।

তোমার কি মনে হয় ও আমাদের কিছু বলবে?’

‘না স্যার, বলবে না।’

‘কী করে বুঝলে?’

‘এরা কিছুই জানে না। কাজেই কিছু বলার প্রশ্ন ওঠে না।’

‘চলো দেখা যাক।’

‘তোমার নাম জয়নাল?’

‘জি।’

‘এই নেংটা মানুষটাকে তুমি চেন?’

‘জি স্যার।’

‘ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।’

জয়নাল মিয়া হতভম্ব হয়ে তাকাল।

তার পা কাঁপতে লাগল—এসব কী শুনছে?

ইমাম সাহেব অস্ফুট একটি ধ্বনি করলেন। মেজর সাহেব বললেন, ‘কিছু বলবে ইমাম?’

‘জি না স্যার।’

‘জয়নাল, তুমি কিছু বলবে?’

‘জি না।’

‘আমি ঠিক করেছি মাস্টারকে এই অবস্থায় তোমার মেয়ের কাছে নিয়ে যাব। জয়নাল, তোমার মেয়েটি কি বাড়িতে আছে?’

জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। মেজর সাহেব হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন, যেন কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঘরে একটি শব্দও হলো না।

‘জয়নাল!’

‘জি।’

‘তোমার মেয়েটি বাড়িতেই আছে আশা করি।’

জয়নাল মিয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মেজর সাহেব ঐচ্ছন্দ্য ধমক দিলেন ‘কান্না বন্ধ করো। কান্না আমার সহ্য হয় না। চলো যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলো চলো।’

আজিজ মাস্টার তখন কথা বলল। অত্যন্ত স্পষ্টস্বরে বলল, ‘মেজর সাহেব, আমি মরবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান।’

মেজর সাহেব মনে হলো বেশ অবাক হলেন। কৌতূহলী গলায় বললেন, ‘মরতে রাজি আছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘ভয় লাগছে না?’

‘লাগছে।’

‘তবু মরতে চাও?’

আজিজ মাস্টার জবাব না দিয়ে নিচু হয়ে তার পাজামা তুলে পরতে শুরু করল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিছুই বললেন না।

আজিজ মাস্টারকে তার প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে রাজাকাররা নিয়ে গেল বিলের দিকে। আজিজ মাস্টার বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে গেল। যাবার আগে ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘লামালিকুম।’ ইমাম সাহেব বা জয়নাল মিয়া কেউ কিছু বলল না।

আজিজ মাস্টার চলে যাবার পর দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বলল না। মেজর সাহেব গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। জয়নাল মিয়া কাঁপতে লাগল থরথর করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জুলঘরের পেছনে কয়েকটি গুলির শব্দ হলো। ইমাম সাহেব ক্রমাগত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন।

মেজর সাহেব বললেন, 'জয়নাল, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও। আমাকে রাগিও না। বলো, মোট কতজন সৈন্য লুকিয়ে আছে তোমাদের জঙ্গল মাঠে? মনে রাখবে আমি একই প্রশ্ন দুবার করব না। বলো, কতজন?'

'প্রায় একশ।'

ইমাম সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকালেন। রফিক অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপতে লাগল।

'এরা কবে এসেছে এই বনে?'

'পরশু।'

'এই গ্রাম থেকে তোমরা কবার খাবার পাঠিয়েছ?'

'তিনবার।'

'আজিজ মাস্টার এবং ইমাম—এরা এ খবর জানে?'

'জি না, এরা বিদেশি মানুষ। এদের কেউ বলে নাই।'

'ঐ সৈন্যরা এখন থেকে কোথায় যাবে জানো?'

'জি না।'

'কেউ জানে?'

'জি না।'

'ওদের মধ্যে কতজন অফিসার আছে?'

'আমি জানি না।'

'ওদের সঙ্গে গোলাবারুদ কী পরিমাণ আছে?'

'জানি না স্যার।'

'ওদের মধ্যে আহত কেউ আছে?'

'আছে।'

'কতজন?'

'ছয়-সাতজন।'

'ওরাও বনেই আছে?'

'জি না।'

'ওরা কোথায়?'

'কৈবর্তপাড়ায়। জেলে পাড়ায়।'

'বনে খাবার নিয়ে কারা যেত?'

'কৈবর্তরা।'

মেজর সাহেব খামলেন। জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে হাঁপাতে লাগল। রফিক এখনো জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

'জি স্যার।'

'তুমি যাও। তোমাকে যেতে বললাম।'

জয়নাল মিয়া নড়ল না। উবু হয়ে বসে রইল। মেজর সাহেব বললেন, 'নাকি যেতে চাও না?'

'যেতে চাই।'

‘তাহলে যাও। দৌড়াও। আমি মত বদলে ফেলবার আগেই দৌড়াও।’

জয়নাল মিয়া উঠে দাঁড়াল। নিচুগলায় বলল, ‘স্যার সলামালিকুম।’

মেজর সাহেব বললেন, ‘ইমাম, তুমি যাও।’

ইমাম সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

‘যাও, যাও। চলে যাও। কুইক।’

ওরা ঘর থেকে বেরুল। ফুল গেট পার হয়েই ছুটে শুরু করল। মেজর সাহেব জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

‘রফিক!’

‘জি স্যার?’

‘জয়নাল কি সত্যি কথা বলল?’

‘মনে হয় না স্যার। প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনেক সময় এ জাতীয় কথা বলা হয়।’

‘কিন্তু আমি জানি ও সত্যি কথাই বলেছে।’

রফিক চুপ করে রইল।

‘এবং আমার মনে হচ্ছে তুমিও তা জানো।’

রফিক তাকাল জানালার দিকে। বাইরে ঘন অন্ধকার।

‘আমার মনে হয় তুমি আরও অনেক কিছুই জানো।’

‘আমি তেমন কিছু জানি না।’

‘তুমি শুধু বলো, তোমাদের সৈন্যরা এখনো কি বনে লুকিয়ে আছে?’

‘আমি কী করে জানব?’

‘তুমি অনেক কিছুই জানো। আমি কৈবর্তপাড়ায় তল্লাশি করতে চেয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে—প্রয়োজন নেই।’

‘আমার ভুল হয়েছিল। সবাই ভুল করে।’

‘ঝড়ের সময় একটা পাগল ছুটে গেল বনের ভেতর। যায়নি?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওকে বনের ভেতর যেতে দেখে তুমি উল্লসিত হয়ে উঠলে।’

রফিক একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

‘বলো, তুমি উল্লসিত হওনি?’

‘ভুল দেখেছেন স্যার।’

‘আমার ধারণা, ঐ পাগলটি বনে খবর নিয়ে গেছে। এবং সবাই পালিয়েছে ঝড়ের সময়।’

মেজর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন কণ্ঠে বললেন, ‘চলো আমার সঙ্গে।’

‘কোথায়?’

‘বুঝতে পারছ না কোথায়? তুমি তো বুদ্ধিমান। তোমার তো বুঝতে পারা উচিত। বলো, বুঝতে পারছ?’

‘পারছি।’

‘ভয় লাগছে?’

‘না!’

‘ওরা কি ঝড়ের সময় পালিয়েছে?’

‘হ্যাঁ। এতক্ষণে ওরা অনেকদূর চলে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি মধুবনের দিকে গেলে হয়তো এখনো ওদের ধরা যাবে।’

‘তুমি আবার আমাকে কনফিউজ করতে চেষ্টা করছ। এরা হয়তো বনেই বসে আছে।’

রফিক মৃদু হাসল।

‘বলো, ওরা কি বনে বসে আছে?’

‘হয়তো আছে। গভীর রাতে বের হয়ে আসবে।’

‘ঠিক করে বলো।’

‘আপনি এখন আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করবেন না। কাজেই কেন শুধু শুধু প্রশ্ন করছেন?’

কৈবর্তপাড়ায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। চিত্রা বুড়ি অবাক হয়ে আগুন দেখছে। রাজাকাররা ছোট্ট ছোট্ট করে। তাদের ছোট্ট ছোট্ট দেখে মনে হয় খুব উৎসাহ বোধ করছে। আগুন জ্বালানোর জন্য তাদের যথেষ্ট খাটাখাটনি করতে হচ্ছে। ভেজা ঘরবাড়ি। আগুন সহজে ধরতে চায় না।

মীর আলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ‘আগুন আগুন’ বলে চিৎকার করছে। সে চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু আগুন দেখতে পাচ্ছে। গ্রামের মানুষজন সব বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

১৬

মেজর এজাজ আহমেদ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশে ডানদিকে, চাইনিজ রাইফেল হাতে দুজন জোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে। রফিক নেমেছে বিলে।

বিলের পানি অসম্ভব ঠান্ডা। রফিক পানি কেটে এগুচ্ছে। কী যেন ঠেকল হাতে। মনার ছোট ভাই বিক। উপড় হয়ে ভাসছে। যেন ভয় পেয়ে কাছে এগিয়ে আসতে চায়। রফিক পরম স্নেহে বিকের গায়ে হাত রেখে বলল, ‘ভয় নাই। ভয়ের কিছুই নাই।’

পাড়ে বসে থাকা মেজর সাহেব বললেন, ‘কার সঙ্গে কথা বলছ রফিক?’

‘নিজের সঙ্গে মেজর সাহেব।’

‘কী বলছ নিজেকে?’

‘সাহস দিচ্ছি। আমি মানুষটা ভীতু।’

‘রফিক!’

‘বলুন।’

‘ওরা কি বন ছেড়ে চলে গেছে? সত্যি করে বলো।’

রফিক বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। আচমকা হাসির শব্দে মেজর সাহেব চমকে উঠলেন।

কৈবর্তপাড়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আলো হয়ে উঠছে চারদিক। রফিককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার। ছোটখাটো অসহায় একটা মানুষ বুকপানিতে দাঁড়িয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন, ‘রফিক, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও?’

রফিক শান্তভাবে বলল, ‘চাই মেজর সাহেব। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি নিজেও চান। চান না?’

মেজর সাহেব চুপ করে রইলেন। রফিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বলল, ‘মেজর সাহেব, আমার কিন্তু মনে হয় না আপনি জীবিত ফিরে যাবেন এ দেশ থেকে।’

মেজর এজাজ আহমেদ সিগারেট ধরালেন, কৈবর্তপাড়ার আশুনের দিকে তাকালেন। পশতু ভাষায় সঙ্গের জোয়ান দুটিকে কী যেন বললেন। গুলির নির্দেশ হয়তো। রফিক বুঝতে পারল না। সে পশতু জানে না।

হ্যাঁ, গুলির নির্দেশই হবে। সৈন্য দুটি বন্দুক তুলছে। রফিক অপেক্ষা করতে লাগল।

বুক পর্যন্ত পানিতে গা ডুবিয়ে লালচে আশুনের আঁচে যে-রফিক দাঁড়িয়ে আছে মেজর এজাজ আহমেদ তাকে চিনতে পারলেন না। এ অন্য রফিক। মেজর এজাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।

- ০ -

শব্দার্থ ও টীকা

- মনিহারী - কাগজ-কলম, খেলনা, কাচের চুড়ি, প্রসাধন সামগ্রী, শৌখিন জিনিস প্রভৃতি খুচরা দ্রব্য বিক্রি হয় এমন।
- ‘বাইরে যাওন দরকার’ - (এখানে) মুদ্রা-ত্যাগের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া।
- ফসর-ফসর - ‘ফসর’ ‘পসরা’ শব্দের আঞ্চলিক রূপভেদ। আলো; কিরণ; প্রভা।
- ওয়াস্ত - সময়কাল।
- প্রহর - তিন ঘণ্টা ব্যাপী সময়। দিনের ২৪ ঘণ্টায় মোট আট প্রহর। ‘রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে’ - রাত রারোটা পার হয়েছে।
- ‘দুপুর-রাইতে’ - মধ্য রাতে।
- ‘মার্চটার্চ না’ - সৈন্য সাধারণত যেভাবে কুচকাওয়াজ করে চলে, সেভাবে না।
- মার্চ - সৈন্যদের কুচকাওয়াজ।
- মার্চটার্চ - দ্বিরুক্ত রূপবিশেষ।
- তারত্বরে - অতি উচ্চ আওয়াজে।
- আছুইন - ‘আছেন’ শব্দের আঞ্চলিক রূপভেদ।
- পুইয়ে যায় - শেষ হয়।
- উজান দেশ - বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর, বিল ও নদীবেষ্টিত বিস্তীর্ণ এলাকা ভাটি অঞ্চল নামে পরিচিত। এখানে ‘উজান দেশ’ বলতে ভাটি অঞ্চলের বাইরের এলাকা বোঝানো হয়েছে।
- নায়েব - জমিদারের স্থানীয় অফিসের প্রধান।
- ‘যখ করে গেছেন’ - ‘যখ’ ‘যক্ষ’ শব্দের বিবর্তিত রূপ। প্রচলিত কাহিনি মোতাবেক, ধনী কৃপণ ব্যক্তির তাদের ধন-সম্পদ পিতলের কলসিতে ভরে মাটির নিচের কুঠুরিতে রাখত, আর সম্পদ পাহারার জন্য একটি কম-বয়সী বালককে কুঠুরিতে আটকে রাখত। বালক মরে যখ হয়ে কুঠুরির ধন-সম্পদ পাহারা দেবে বলে তারা বিশ্বাস করত। এখানে লোকপ্রচলিত সে কাহিনিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
- বিদেশি লোক - এখানে বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের লোক বোঝাচ্ছে। দেশের লোককে বিদেশি ভাবার মধ্য দিয়ে নীলগঞ্জ অঞ্চলের মানুষদের বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়।
- কৈবর্ত - জেলে সম্প্রদায় বিশেষ।
- জলমহাল - হাওর, বিল-ঝিল, নদী-নালা, খালসহ যেকোনো জলাভূমির মাছ আহরণের এলাকাকে জলমহাল বলা হয়।

- দহ - জলাশয়ের গভীর অংশ।
- 'জোড়া পাঠা দিমু' - দেবীর উদ্দেশে এক জোড়া পাঠা বলি দেবে।
- গণ্ডগ্রাম - ক্ষুদ্র গ্রাম।
- চউক্ষের ধান্দা - চোখের বাঁধা। দেখার ভুল।
- আয়াতুল কুর্সি - কোরআনের সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত। ইসলামি বিশ্বাস মোতাবেক, এ আয়াত পড়ার বিশেষ ফজিলত আছে।
- দোয়া ইউনুস - কোরআনের সূরা আশ্বিয়ার ৮৭ নম্বর আয়াত। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, এ আয়াত পড়ার ফলে নবি ইউনুস মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এ কারণেই আয়াতটির এরকম নামকরণ হয়েছে।
- ইয়া মুকাদ্দেমু - আল্লাহর গুণবাচক নিরানব্বই নামের একটি।
- রজ্জুতে সর্পভ্রম - দড়িকে সাপ ভেবে ভুল করা।
- নগদ বিদায় - নগদ টাকা দিয়ে বিদায়। এখানে 'উপরি আয়' বোঝানো হয়েছে।
- হ্যাভারস্যাক - সৈন্যদের খাদ্য বহনের জন্য ব্যবহৃত কোলাবিশেষ। [ইংরেজি haver sack]।
- সন্ধ্যাসী - গৃহত্যাগী নিরাসক্ত মানুষ।
- উত্তরবান্দে - গ্রামের উত্তরপার্শ্বস্থ ফসলের মাঠে।
- সুলত - মুসলমান পুরুষের লিঙ্গতুক ছেদ করার রীতি। জনভাষায় 'মুসলমানি' নামেও পরিচিত।
- শরিফ আদমি - ভদ্রলোক।
- ট্রানজিস্টার - একসময় রেডিওকে এ নামে ডাকা হতো।
- খেলাপ - নড়চড়; ব্যতিক্রম; ব্যত্যয়; অন্যথা।
- ইস্ট-বেঙ্গল রেজিমেন্ট - পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি সৈনিক নিয়ে গঠিত রেজিমেন্ট।
- কম্পানি - দেড়-দুশ সৈন্যের একটি দল।
- রাজাকার - আক্ষরিক অর্থ স্বেচ্ছাসেবক। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধে সহায়তার জন্য স্থানীয়দের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করে।
- গিরগিটি - টিকটিকি জাতীয় একপ্রকার সরীসৃপ।
- মরতবা - গুণ; সম্মান; মর্যাদা।
- নন কমিশন্ড অফিসার - পদোন্নতি পেয়ে অফিসার হয়েছে এমন।
- ইনস্টিংক্ট - সহজাত প্রবৃত্তি।
- রুদ্রমূর্তি - ভয়ঙ্কর মূর্তি।
- 'পার্সোনালিটি গণকন্ট্রোল' - কোনো বিশেষ বিষয়ে অনার্সসহ কিএ পাশ করেনি এমন। ইন্টারমিডিয়েট পাশের পরে দুই বছরে এ ডিগ্রি করা যেত। এখন বাংলাদেশে এটা তিন বছরের ডিগ্রি। এ ডিগ্রিধারীদের সাধারণভাবে 'ডিগ্রিপাশ'ও বলা হয়।
- কিংস্টোন ট্রয়ো - উনিশশো ষাটের দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা আমেরিকার ফোক ও পপ সঙ্গীতের দল। The Kingston Trio.
- চিলেকোঠা - ছাদের ছোট ঘরবিশেষ।
- প্রিভিলেজ - বিশেষ সুবিধা। privilege.
- পশতু ভাষা - পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে প্রচলিত ভাষাবিশেষ। পাঠানদের ভাষা।